মানব হিতকর গ্রন্থাবলী—১

ভাগ্য পরিবর্ত্তনের উপায়।

The Most Wonderful Drugless Treatment

FOR

Bettering Your Condition

AND

A DIVINE BOON TO HUMANITY.

পরিব্রাজক—

শ্রীকুমার ব্রহ্মচারী।

২য় সংস্করণ ১৩৩৬

প্রথমেই ভূমিকা দেখুন।

[মূল্য—অমূল্য।

উৎসর্গ পত্র

এ গ্রন্থ গ্রন্থকার অভিমানে লিখেন নাই, যিনি লিখাইয়াছেন তাঁহারই শ্রীচরণে এ গ্রন্থ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি রূপে অর্ঘ্য দেওয়া হইল, এবং তিনিই ইহার যশ অযশ ভাগী হইবেন।

নিবেদক

শ্রীকুমার ব্রহ্মচারী

OWNER

Name... ... ...

Address... ... ...

Date... ... ...

ভূমিকা

(১) যিনি যত বড় বিদ্বান, অবিদ্বান, জ্ঞানী, অজ্ঞান অথবা ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক হউন না কেন এ গ্রন্থ নূতন জ্ঞানালোক সৃষ্টি করিয়া সকলের হৃদয়েই নবশক্তির সঞ্চার করিবে, এবং অশান্তিপূর্ণ জীবনকে ইহ ও পরলোকে সুখ শান্তি পূর্ণ করিবে। ইহাতে এমন নূতন কিছু নাই, তথাপি ইহার মধ্যে এমন নূতনত্ব রহিয়াছে যাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারিবেন।

বলা বাহুল্য বহু পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। "ফলেন পরিচীয়তে"।

(২) সতর্কতা—কেহ দুই এক লাইন অথবা ভূমিকা ও সূচীপত্র ব্যতীত অন্য কিছু নাম সহির পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না, কারণ ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইবে।

(৩) এ গ্রন্থের কোন মূল্য লওয়া হইবে না, কিন্তু পরীক্ষায় উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা অনুভব করিলে যৎসামান্য পাথেয় খরচ দিতে হইবে, অসত্যতা অনুভব করিলে তাহাও দিতে হইবে না, পরন্তু গ্রন্থ খানা তাঁহাকে দেওয়া হইবে। পরীক্ষার জন্য অন্ততঃ দুই দিন সময় দেওয়া হয়। যদি ইহার বিরুদ্ধে কাহারও অন্তঃকরণে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে জানাইলে আশ্রম বিশেষ উপকৃত হইবেন, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সত্য অবলম্বনে লিখিত। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে এ গ্রন্থ দ্বারা

যে কতদূর সফলতা লাভ করা যাইবে তাহা যিনি লিখাইয়াছেন তিনিই জানেন।

(৪) দেখা যায় যে বর্ত্তমানে অনেকে ধর্ম্মোপদেশের প্রার্থী। সে হেতু আমরা বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া কেবল তাঁহাদের জন্যই জগৎ-পিতার অমূল্য দান বিলাইয়া দিতে আসিয়াছি। কারণ শাস্ত্রে আছে—যে অজ্ঞ তাহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, জন্মাইলে তোমারই খারাপ হইবে।

(৫) এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেকের নিন্দাবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। অনেকে বলেন নিন্দা সাধুজনোচিত হয় নাই, কারণ শাস্ত্রে পরনিন্দা মহাপাপের কার্য্য। কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্ম অনেকেই অবগত নহেন, নিন্দা, নিন্দিত ব্যক্তির সংশোধনের জন্য হইলে তাহা পাপ হয় না, জিগীষা বা পরাভব উদ্দেশ্যে যে নিন্দা তাহাই পাপের কার্য্য। নিন্দা সাধকের উপাস্য, জ্ঞানিগণ নিন্দাকে পরম মিত্র জ্ঞান করেন। নিন্দা না থাকিলে সমাজ ও দেশ বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত, যার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। নিন্দা যে দোষের নয় এবিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

"অনন্তপারং কিলশব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥"

(৬)। অর্থাৎ—শাস্ত্র ত অনেক, আয়ুও অল্প, আবার বিঘ্নও অনন্ত। অতএব সার যাহা তাহাই জান। হংস যেমন জল ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ অসার ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর। যাঁহারা সংসার-তাপিত, শোকদুঃখে জর্জ্জরিত, তাঁহারা এ গ্রন্থে শান্তির সন্ধান পাইবেন।

(৭) আপনার বল যথা গজ নাহি জানে,
মাহুত চালায় তারে ঠেলি দুই কাণে,
তেমনি মানব তুমি প্রতাপে অতুল,
চালায় তোমারে মন দিয়ে কত ভুল,
স্বাধীন মানব হও শুদ্ধ করি মন,
অধীনতায় বহু দুঃখ জানিবে কারণ।

(৮) "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥" (মনুসংহিতা)

অর্থাৎ—পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ—সুখ দুঃখের এই সংক্ষেপ লক্ষণ জানিবে।

(৯) "পলে পলে পরমায়ু পাইতেছে ক্ষয়।
জ্ঞানালোকে শান্ত কর অশান্ত হৃদয়॥"

সূচীপত্র।

৩। ভক্তের ভগবান।

৪। ইহ ও পরলোকে দাতার চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রণালী।

৫। ইহ ও পরলোকে ভগবান্‌কে লাভ করিবার প্রণালী।

৬। প্রশ্নোত্তর।

৭। উপদেশ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে মন,
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন।
নবদ্বার দেহপুরে কালরূপী তস্করে,
প্রতিদিন আয়ু হরে, নাহি অন্বেষণ।
মোহরাত্রি তম ঘন, মায়ানিদ্রা প্রাণীগণ,
প্রহরি নাহিক কোন, কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে জ্ঞান অসি করে ধরে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ।

ভ্রান্তি।

এ সংসার কেবা কার, বড় চমৎকার।
ক্ষণেকের তরে করি পর আপনার॥
কিছুই জানিনা আমি, নিজ সুখ সার।
হাসিতে খেলিতে সন্ধ্যা ঘোর অন্ধকার॥

এই পর্য্যন্তই নাম সহির পূর্ব্বে দেখিতে পারিবেন।

সুখের ফোয়ারা যেথা ছিল অনিবার।
দেখিতে দেখিতে তথা মৃত্যু সমাচার॥
হায়রে! জগৎ তোর এই কিরে ধারা।
কভু সুখে কভু দুঃখে, রাখ মাতোয়ারা॥
এ জগতে কিছু কিরে নাহি আছে সার?
তবে কিসে ঈশ্বরের করুণা অপার?
যেখানে তাঁহার প্রেমে মহানন্দ আছে।
যথায় সাধনা করি যাই তাঁর কাছে॥
সে জগৎ মন্দ কিসে কে বলিতে পারে?
যে কখন পড়ে নাই পাপ অত্যাচারে॥
জগৎ কর্ম্মের ক্ষেত্র যে ভুলিয়া যায়।
স্বেচ্ছাচারী সে বিলাসী করে হায় হায়॥
মৃত্যুকাল সমাগতে তার মহা দায়।
তারি ভয়, পাপী আমি কোথায় পলায়?
নির্ভয় সাধন মগ্ন সাধু তার নামে।
অনায়াসে চলে যায় তার নিত্যধামে॥
আপন কর্ম্মের ফল কে না পায় ভবে?
মিছে কেন জগতের দোষ দাও তবে?
ভাল কর্ম্ম কর যদি ভাল পাবে ফল।
মন্দ কর্ম্মে দুঃখ শোক নরক কেবল॥
তাই বলি "বাহে গুরু" নাম কর সার।
যে নামে কলির জীব পাইবে নিস্তার॥

মানব হিতকর গ্রন্থাবলী।

১। বিনা ঔষধে দেহ সুস্থ রাখিবার প্রণালী।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

অর্থাৎ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষই মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য, আরোগ্যই এই চতুর্ব্বর্গ ফলের মূল স্বরূপ। শরীর সুস্থ না থাকিলে ইহার কোনটিরই লাভ হয় না; সে জন্য সুস্থ ভিখারী অসুস্থ রাজার চেয়েও সুখী। তাই সর্ব্ব প্রথমে কি উপায়ে এই শরীর সুস্থ রাখা যায়, এবং কেনই বা শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহা বিবৃত করিতেছি। প্রথমটি হইতেছে যে অসুস্থ শরীরকে সুস্থ রাখিবার ডাক্তারী, কবিরাজী ইত্যাদি নানারূপ চিকিৎসার উপায় আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাতে কেহই সুস্থ হইতেছে না, অতি প্রবল আক্রমণের সময় ক্ষণিক উপশম হইতেছে। এই ক্ষণিক উপশমের জন্য অনেকে শত শত টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভাবে চলিলে চিরদিন সুস্থ থাকিতে পারা যায় এমন সরল সুপথ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেও অনেকে দেখিতে চান না। এ জগতে এমন কে আছেন যে, যিনি বলিতে পারেন 'আমি সুস্থ আছি'? বর্ত্তমানে শরীর ব্যাধি মন্দির (শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাক, এ বিষয় বলা বাহুল্য, ভুক্তভোগী মাত্রেই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। ইহার সরল সুপথ এই যে—দেবমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিলে তোমার দেহমন্দিরেরও জীর্ণ সংস্কার করা হইবে। কিন্তু

বর্ত্তমান ডাক্তারী, কবিরাজী চিকিৎসায় হইবে না। শাস্ত্রে আছে—'যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল' (Tit for tat or where there is action there is reaction) এখনও এই স্বতঃসিদ্ধটি (Axiom) ইহ ও পরজগতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘোষণা করিতেছে যথা—একজনকে প্রাণে বধ কর, দুদিন পরে তোমাকেও প্রাণে বধ (ফাঁসী) পাইতে হইবে। পরের জন্য রাস্তায় গর্ত্ত করিলে নিজেরই সেই গর্ত্তে পতিত হইতে হয়। যাহা আহার করা যায় তাহারই উদ্গার উঠে। আর পরজগতে ঐ কথাটি প্রমাণ করিতেছে যে, তারকেশ্বর বা বৈদ্যনাথধামে কোন রোগের জন্য হত্যা দিলে আদেশ হয় যে, তুমি পূর্ব্বজন্মে মাতাকে লাথি মারিয়াছিলে, তাই তোমার এজন্মে শূলবেদনা হইয়াছে, তোমার মাতা অমুক স্থানে জন্ম নিয়াছে তাহার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে আরোগ্য হইবে ইত্যাদি...। বাস্তবিক তাহাতেই রোগারোগ্য হয়, এবং ইহাই প্রকৃত দৈব বল। (ন চ দৈবাৎ পরং বলম্)

জিজ্ঞাসু—আচ্ছা, যাঁহারা কন্যাদায়গ্রস্ত তাঁহাদের পূর্ব্বকর্ম্ম কি ?

বক্তা—তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে কন্যাকে বিক্রয় করিয়াছি'লেন, তাই বর্ত্তমানে কন্যার পিতা হইয়া তাহার প্রতিফল পাইতেছেন। অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে কোন কোন বংশে বা কুলে কন্যার পিতা হওয়া বড়ই সুখের ছিল, কারণ পিতা কন্যাকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় করিতেন, কন্যা যত বৎসর বয়সের হইত

কমপক্ষে তত শত টাকায় তাহাকে বিক্রয় করা হইত। পূর্ব্বে কন্যা জন্ম হইলে মাংস বিক্রয়ী পিতার মনে কতই আনন্দ হইত; এখন কন্যা জন্ম হইলে দরিদ্র পিতার মুখ শুকাইয়া যায়। এখন বুঝিতে পারিলেন "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল" কথাটি সত্য কি না।

জিজ্ঞাসু—না, এখনো ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। আচ্ছা, যাঁহারা ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাদের কর্ম্মফল কি?

বক্তা—তাঁহাদের কর্ম্মফল এই যে, এজন্মে আমি তোমাদিগকে স্থান দান করিতেছি, পরজন্মে তোমরাও আমাকে স্থান দান করিবে। অর্থাৎ আমি রাজা বা জমিদার হইয়া থাকিব। বলা বাহুল্য যদিও দাতা এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ নাও করেন তথাপি ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে (By nature) অথবা ভগবানের ব্যবস্থামত হইয়া থাকে। কিন্তু অথিতিকে একদিনের অতিরিক্ত ধর্ম্মশালায় স্থান না দেওয়া কি উচিত? প্রত্যহ নূতন নূতন লোককে স্থান দিলে কি বেশী ধর্ম্ম হয়? বোধ হয় এই কারণেই রাজা মহারাজা রাজ্যচ্যুত হইতেছেন। বলা বাহুল্য এরূপ যত সুখ দুঃখ আমাদের হয় তাহার মূলে "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল" এই ধ্রুব সত্যটি আছে। স্থির মনে চিন্তা করিলে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ভাল বা মন্দ জানিত বা অজানিত ভাবে একগুণ ভাল বা মন্দ কর্ম্ম করিলে অন্ততঃ দশগুণ ফল হয়। যথা—চোরে চুরি করে, কিন্তু এমন এক সময় আসে যে দশগুণ দিয়াও নিস্তার পায়

না। যিনি ঈশ্বর মানেন না তাঁহাকেও ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ Law of nature বলিয়া মানিতে হয়।

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা চিকিৎসা সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন তাঁহাদের কর্ম্মফল কি?

বক্তা—এখনো দেখিতেছি তোমার ভ্রম যায় নাই। এ ক্ষুদ্র লেখনীতে আর কত প্রকাশ করিব। যাঁহারা বর্ত্তমানে চিকিৎসা সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন, তাঁহারা তো অধর্ম্ম করিতেছেন এবং যাহারা ঐ বিষয় তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন, তাঁহারাও ঐ অধর্ম্মের অংশী হইতেছেন। শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার পাপীর উল্লেখ দেখা যায়, যথা—কর্ত্তা, প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক, নিমিত্তী এই পাঁচ প্রকার পাপী।

১। কর্ত্তা—যৎকর্ত্তৃক প্রাণ বিয়োগ হয় তিনি কর্ত্তা।

২। প্রযোজক—যে ব্যক্তি বধাদি কার্য্য সমাধার জন্য অন্য ব্যক্তিকে বেতনাদি দ্বারা প্রবৃত্ত করান বা স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রণা ও বধোপায়াদি প্রদর্শন দ্বারা উৎসাহিত করেন তিনি প্রযোজক।

৩। অনুমন্তা—আমি ইহাকে হনন করি, এই প্রকারে কথিত বাক্যে যিনি অনুমতি দেন, বা নিষেধে সমর্থ হইয়াও যিনি একার্য্যে নিষেধ না করেন, তিনি অনুমন্তা।

৪। অনুগ্রাহক—যিনি বধ্য জীবের পলায়ন পথ রোধ করেন তিনি অনুগ্রাহক।

৫। নিমিত্তী—হনন হউক এই ইচ্ছায় যিনি হন্তার

ক্রোধোৎপাদন করেন তিনি নিমিত্তী। এই পাঁচ প্রকার পাপী।

জিজ্ঞাসু—সে কেমন কথা! বহু লোক ত হাঁসপাতাল, চিকিৎসালয় ইত্যাদিতে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন। তাঁহারা কি পাপের কার্য্য করিতেছেন?

বক্তা—হাঁ! অস্থির হইও না, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। চিকিৎসা, তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রগুলি বর্ত্তমানে অসম্পূর্ণ। বলা বাহুল্য উক্ত শাস্ত্র (Science) সৃষ্টিকর্ত্তারা যদিও ইহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তৎপরবর্ত্তী শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে অসম্পূর্ণ রাখিতেছেন। তাঁহাদিগের উপদিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সাধনা সাপেক্ষ, কেবল পাখীপড়া বোল নহে। সেই সাধক চিকিৎসকই * রোগ আরোগ্য করিতে পারেন, অন্যে তাহা পারেন না, তাই এখন জগতে চিকিৎসার ফলে কেহই আরোগ্যলাভ করেন না। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে একবার আপন আপন রোগের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই ইহার যথার্থ সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। কেহ এক আনা মাত্রায় আর কেহবা বার আনা মাত্রায় রোগগ্রস্ত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সবই রোগী। যাহাকে লোকে সাধারণত আরোগ্য বলে তাহা প্রকৃত পক্ষে আরোগ্য নহে। ঔষধের দ্বারা রোগ চাপা পড়ে (Suppresed)। কিন্তু নিত্য নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়া রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। অনাদিকাল

* ৺গঙ্গাধর কবিরাজ, ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন, দেবদত্ত পণ্ডিত প্রভৃতি।

হইতে ঔষধ সকল অভিজ্ঞতার উপর (Experimentএ) চলিয়া আসিতেছে, এবং অধিকাংশ স্থলে রোগী এই ঔষধের ফলে অকালে প্রাণ হারাইতেছে। যদি ইহা ঠিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা হইত তবে দশজন চিকিৎসকের ঔষধ প্রয়োগ একই রকমের হইত বিভিন্নরূপ হইত না। বর্ত্তমানে যতই শিক্ষা বিস্তার হইতেছে ততই দেশের দারিদ্র্য এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইরূপ আপনি যতই চিকিৎসার উন্নতি কল্পে সাহায্য করিবেন ততই রোগ, রোগী এবং চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে দরিদ্র অশিক্ষিত লোকগুলি অকালে প্রাণ হারাইবে। ইহা দেখা যায় যে, ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে স্থানে এই চিকিৎসা প্রচার হয় নাই বা অল্প মাত্রায় হইয়াছে সেই স্থানের লোকগুলি এখনো অনেকটা সুস্থ আছে। আমাদের মধ্যেও অশিক্ষিত নীচ জাতিকে অধিকাংশ সুস্থ ও সবল দেখা যায়। শিক্ষিতের মধ্যেও দুই একজনকে বাল্যকালে সুস্থ দেখা যায় বটে। কিন্তু উহারাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ ব্যবহারের ফলে চিররোগী হইয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছেন। অকাল মৃত্যুর অন্যান্য কারণ থাকিলেও চিকিৎসাও যে একটি কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মানুষের জীবন থাকিতে যে জীবনপ্রদীপ প্রবল ঝড়ে নিবিয়া যায়, তাহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—সতীদাহ প্রথা, ট্রেণ দুর্ঘটনা অথবা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন ইত্যাদি। অবশ্য অদৃষ্টবাদী এরূপ

স্থলে অদৃষ্টেরই দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল অদৃষ্টের দ্বারা কোন কিছুই ঘটে না পুরুষকারেরও প্রয়োজন। ইহাই বিজ্ঞান সম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আয়ুর বৃদ্ধির যখন উপায় আছে, তখন নিশ্চয়ই কমাইবার উপায় রহিয়াছে। যে স্থলে রোগী চিকিৎসককে পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, ধন দৌলতের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে, সে স্থলে চিকিৎসকের কি তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকের ন্যায় কাজ করা উচিত? তাঁহাদের জীবন লইয়া খেলা করা কি উচিত? অবশ্য প্রত্যেক চিকিৎসক নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আরোগ্যের চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে কি হয়? তাঁহারা যে অনধিকার চর্চ্চায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার পরিণাম ফল একবার ভাবিয়া থাকেন কি? আবার অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় এই অনধিকার চর্চ্চার মধ্যে একে অন্যকে হিংসাদ্বেষ করিয়া পরস্পরকে হাতুড়ে বৈদ্য (Quack) বলিতে কুণ্ঠিত হন না। চিকিৎসা জগতে বর্ত্তমানে কে হাতুড়ে বৈদ্য তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি? ইহা কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের জীবনী পাঠে জানিতে পারিবেন। যাঁহাকে কলিকাতা সহরে একশত টাকা ভিজিট দিয়াও পাওয়া যায় নাই, এহেন উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসককে চিকিৎসকেরা শত্রুতা করিয়া প্রথম অবস্থায় কিরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল তাহা

ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অবশ্য ভগবানের রাজ্যে রোগের ঔষধ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা রোগের অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে ক'জনার আছে? অন্ততঃ যতদিন না ভারতে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির ন্যায় ক্ষমতা না জন্মে ততদিন রোগীর জীবন নিয়া প্রাক্টিস করা কি উচিত? না ততদিন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত? না শিখিয়া ওস্তাদি করিলে কি হয়? পাঠকগণ একবার ইহা ভাবিয়া দেখুন। অধুনা চিকিৎসা বিদ্যা অর্থের জন্যই, জীবের মঙ্গলের জন্য নয়। যাঁহারা এই চিকিৎসা ভারতে প্রচার করিতেছেন তাঁহারাও ইহার বিষময় ফল বিশেষরূপে অবগত হইয়াও বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। কারণ বিলাত হইতে ভারতে প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকার ঔষধ আমদানী হইয়া থাকে। অথচ আমাদের ভারতবাসী ঐ বিষয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া ভাবিতেছেন কতবড় পুণ্যের কাজ করিয়াছি, ইহ ও পরকাল উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু দ্বারে ভিক্ষুক গেলে একমুষ্টি ভিক্ষা না দেওয়া ইঁহারাই অন্যায় মনে করেন না। হায়! তাঁহাদের পরিণাম যে কি আমি ভাবিয়াই অস্থির। যদিও সেবার চেয়ে ধর্ম্ম নাই, তথাপি বর্ত্তমান চিকিৎসা সেবা নয়। ইহার অন্য নাম 'মানুষ মারা কল' (Man killing machine)। ইহা দ্বারা দুই উপায়ে মনুষকে মারা যায়, একটি হঠাৎ আর অপরটি ক্রমে ক্রমে ভোগাইয়া। চিকিৎসা জগতে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার কয়িয়াছেন, তাঁহাদের জীবনীপাঠে

ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অথবা নিজের জ্ঞান থাকিলে নিজেই অনুভব করিতে পারিবেন। যাঁহারা ঐ বিষয় সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যের ফল এই—এজন্মে তুমি আমাকে এরূপ কষ্ট দিয়া প্রাণে বধ করিতেছ, পরজন্মে আমিও তোমাকে এরচেয়ে দশগুণ অধিক কষ্ট দিয়া প্রাণে বধ করিব। যদি আপনি 'যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল' কথাটি স্বীকার করেন। শাস্ত্র চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদিগকে কোন সৎকার্য্যে আহ্বান করিবে না। (মনুসংহিতা) ভারতে বর্ত্তমানে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারেন এবং বহু অসাধ্য রোগ দৈব শক্তিদ্বারা আরোগ্য করিতে পারেন। অন্ততঃ ধনীরা যদি ইহার উন্নতিকল্পে সাধু সন্ন্যাসীকে সাহায্য করিতেন তাহা হইলেও উঁহাদের টাকা সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত।

জিজ্ঞাসু—এলোপ্যাথী চিকিৎসার উন্নতিকল্পে সাহায্য কি সৎকার্য্য নয় ?

বক্তা—না। ভারতের লুপ্ত চিকিৎসার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। বর্ত্তমান চিকিৎসা যে কতদূর নিকৃষ্ট তাহা জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানকে এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে কি বলিব। এখনও ভারতে অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিনা ঔষধে শুধু শরীর চাটিয়া বা উহাতে হাত বুলাইয়া অথবা মন্ত্রশক্তিদ্বারা অনেক অসাধ্য রোগ আরাম করিতেছেন,

ঐ সকল রোগের নাম পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসা গ্রন্থে পাওয়া যায় না, ঔষধ ত দূরের কথা। তা ছাড়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা তাঁহারা দুই তিনদিনের মৃতব্যক্তিকে জীবিত করিতেছেন। ১৩৩২। ২১শে ফাল্গুন হিতবাদীতে লিখিয়াছেন যে—জেনারেল স্যার জেমস্ উইলকক্ বহুদিন ভারতের সামরিক বিভাগে কাজ করিয়া সম্প্রতি ইভিনিং নিউজ পত্রে লিখিয়াছেন হিমালয়ের পাদদেশে এক যোগী তাঁহার একটি মৃত আত্মীয়কে তিনদিন পরে জীবিত করিয়া দিয়াছেন। যদিও যোগীদিগকে বিলাতের লোকেরা এখনও বিশ্বাস করেন না, তথাপি আমি ইহা চাক্ষুষ দেখিয়া বিশ্বাস না করিতে পারিলাম না। এরূপ বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধু সন্যাসীর মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার একটা ধারা এখনো অনেকে রক্ষা করিতেছেন। ভারতে মন্ত্রের অলৌকিক শক্তির কথা যে এককালে শুনা যাইত তাহা নানা কারণে এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের নিকট তন্ত্র মন্ত্র আরও দূষণীয় হইয়াছে। বন্যার জলে লবণ প্রস্তুত করিলে কতই শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তন্ত্রে মন্ত্রেও ঐরূপ জানিবেন। যাক্ ঐ বিষয় বিশেষ বলা বাহুল্য। শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুনুন—

"ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণে রোগশান্তয়ে।
দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ॥"

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি রোগীর রোগ শান্তির নিমিত্ত ঔষধ, স্নেহদ্রব্য ও আহার্য্য সামগ্রী দান করে, সে কদাচ রোগী হয় না,

সুখী ও দীর্ঘায়ু জীবন লাভ করে। ইহাতেও 'যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল' প্রতিপন্ন হইল। তবে উক্ত ফলের ইচ্ছা থাকিলে বর্ত্তমানে ভারতের দেবমন্দির গুলির জীর্ণ সংস্কার করিলে দেহ মন্দিরেরও জীর্ণ সংস্কার করা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান চিকিৎসা দ্বারা সম্ভব হইবে না। উপযুক্ত কার্য্য করিয়া হাতে হাতে ফল না পাইলে তজ্জন্য আশ্রম দায়ী থাকিবেন। কিন্তু কার্য্যের পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। অথবা শাস্ত্র বলিতেছেন—'অন্নমেব যত প্রাণাঃ প্রাণদান সমং হিতং।' অর্থাৎ—কলিতে অন্নগত প্রাণ, তাই অন্নদান এবং প্রাণ দান উভয়ই সমান। তবে এ কথা যেন স্মরণ থাকে—

"যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতিঃ॥"

অর্থাৎ—যতক্ষণ কণ্ঠে প্রাণ থাকে ও ইন্দ্রিয় গুলি নিস্তেজ না হয় ততক্ষণ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য কারণ কালের কুটিল গতি। কিন্তু বর্ত্তমান মানুষ মারা কল প্রতিষ্ঠায় সহানুভূতি দ্বারা ধর্ম্ম হইতে পারে না।

দ্বিতীয়টি হইতেছে যে—পূর্ব্বে লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রণালী সমস্তই ধর্ম্মের সহিত সংযোজিত ছিল, কারণ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই বলে পাপ ব্যতীত রোগ হয় না, চৌর্য্য, প্রাণিহত্যা প্রভৃতিই যে পাপ তাহা নহে। অক্ষুধায় আহার, অহিত আহার, অকর্ত্তব্য করণ, অনশন প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার বিপরীত কার্য্য সমূহ পাপেরই কারণ। পূর্ব্বে লোকের ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, সুতরাং অনেকেই অধর্ম্মের ভয়ে স্বাস্থ্যহানিকর কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না; মুনিদিগের বাক্য, বেদবাক্য সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন কর্ত্তব্য, বিচার নাই, অন্যায় তর্ক নাই! আর এখন প্রত্যেক কথাতেই তর্ক, প্রত্যেক কথাতেই অবিশ্বাস।

২। ইহ ও পরলোকে সুখী হইবার প্রণালী এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মের পরিণাম।

আমরা কেন দুঃখ ভোগ করি? কেন শান্তিলাভ হয় না? কি উপায়ে প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করা যাইতে পারে? প্রকৃত কারণ ও উপায় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সত্য, দয়া, শান্তি এবং অহিংসা—ধর্ম্মের এই পূর্ণ ৪টি পাদ। অর্থাৎ ষোল আনা। ইহার মধ্যে দ্বাদশ প্রকার সত্য, ছয় প্রকার দয়া ও ত্রিশ প্রকার শান্তি। সত্যযুগে এই ধর্ম্ম পূর্ণ-মাত্রায় ছিল, তৎপর দেবতারা অহঙ্কারে প্রতি যুগে চারি আনা মাত্রায় হ্রাস করায় ত্রেতায় বার আনা, দ্বাপরে আট আনা এবং কলিতে চারি আনা মাত্রায় ধর্ম্ম। কলিতে যখন এই চারি আনা ধর্ম্ম নষ্ট হইবে তখন মহাপ্রলয় হইয়া পুনরায় সত্যযুগের সৃষ্টি হইবে (শ্রীমদ্ভাগবত)। বলা বাহুল্য ধবল গিরির ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের নিকট হইতেও খবর পাওয়া যায় যে ৫০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র জগতে এক হিন্দু রাজা দ্বারা রাজ্য শাসিত হইবে। তখন বিধর্ম্মীরা হিন্দু পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। বর্ত্তমানেও ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়—লণ্ডণ সহরে মৃতের জন্য বার্ণিং ঘাট তৈয়ার হইয়াছে। তা' ছাড়া তথায় কলেজে গীতা,

শ্রীমদ্ভাগবত, চণ্ডী ইত্যাদি পড়ানো হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ছয় হাজার টাকা মূল্য দিয়া কতকগুলি তন্ত্র শাস্ত্রও ক্রয় করিয়াছেন, ইহা বসুমতীর গ্রাহকদের নিকট নূতন নয় এবং জ্যোতিষের সার গ্রন্থ ভৃগুসংহিতা নেপাল হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে নকল করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছেন। আবার অনেকে নিরামিষ ভক্ষণের পক্ষপাতী হইতেছেন।

"জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, হিন্দুধর্ম্ম মাঝে,
এমন কি গৌরবের বিষয় বিরাজে
যাহাতে বিধর্ম্মী যত তত্ত্বলাভ তরে
নিজ নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি হিন্দু হবে পরে।"

সন্তান উত্তরে ধীরে জ্বলি হুতাশন,
স্বভাবে গগণ পথে করে আরোহণ।
সেইরূপ ধর্ম্মের পিপাসা হুতাশন,
প্রজ্জ্বলিত হয় যার, করে অন্বেষণ,
কোথায় বিরাজে সত্য ধর্ম্ম সনাতন,
কোথা শান্তি স্থির শান্তি আনন্দ রতন।
পূর্ব্বলোকে পরলোকে চিন্তা আসে তার,
ভোলে না সে বাহ্যিক মাধুর্য্যে কভু আর।

ব্লাভাস্কী, অল্‌কট্‌, অ্যানিবেশান্ত প্রভৃতি,
আনিয়াছে জড়লোকে সংযমের নীতি।
অমান্য যা ছিল ক্রমে করিতেছে মান্য,
বহুরূপে স্বীকারিছে আর্য্যের প্রাধান্য।

যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি চারিপথ ভবে,
আর্য্য-শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোথাও না পাবে।
অসম্পূর্ণ অন্য যত ধর্ম্ম শাস্ত্র হয়,
পরাভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান তাহাতে না রয়।
বিচারিয়া সাধকের অবস্থা সকল,
বিহিত না আছে বিধি সাধনা মঙ্গল॥
না বিচারি অধিকার সর্ব্বজন তরে,
একবিধি বিদ্যমান যে ধর্ম্ম নগরে।
অধিবাসী তার যারা ক্রমে দূরে যায়,
বিশেষতঃ উত্তমের ঘটে অন্তরায়।
কিন্তু হের আর্য্যলোকে যে জন যেমন,
তার জন্য আছে বিধি বিহিত তেমন।
জ্বর, বাত, কাশ কিম্বা ঘটে আমাশয়,
সর্ব্বরোগে একৌষধ আর্য্য বিধি নয়।
রাজসিক, তামসিক সাত্বিক স্বভাবে,
মুক্তি হেতু আচরিবে ধর্ম্ম ভিন্ন ভাবে।
গুণগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী হইবে যে জন,
অন্বেষণ করিবে সে ধর্ম্ম সনাতন।

বলা বাহুল্য, ভগবান যখন দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী সূর্য্যের আলো, বাতাস, নদ-নদীর জল, আহার্য্য ইত্যাদির

বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন উক্ত ব্যবস্থা কোন্ সাহসে অনেকে রোধ করিতে চায় ?

যে দেশে প্রায় ষোল আনা লোক সততা ভুলিয়া গিয়াছে, সে দেশ শুধু তাঁতির কাজ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবে ইহা [illegible] যে দেশ কথায় কথায় অত্যাচার. কথায় কথায় প্রতারণা, সর্ব্বদা অপরের অনিষ্ট চিন্তা, গৃহবিবাদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সে দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী সুমুখী হন না। আমরা যতই অন্যায় ভাবে চলিতেছি গভর্ণমেণ্টও সেইরূপ ভাবের নিত্য নূতন আইন পাস করিতেছেন, আর জগৎ-পিতা পরমেশ্বর তার চেয়েও কঠিনতম আইন পাস করিতেছেন। ইহা কি কেহ একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? যথা— বৃষ্টির সময় বৃষ্টি হইবে না, গাছে ফল ধরিবে না, পুকুরে পানীয় জল থাকিবে না, গাভীতে দুগ্ধ থাকিবে না, জমির উর্ব্বরতা শক্তি থাকিবে না, স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নৈসর্গিক উৎপাত, আগ্নেয়গিরির অতর্কিত অগ্নিস্রাব ইত্যাদি হইবে। যে স্থানে এগুলি দৃষ্ট হয় সে স্থানে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, নিজের উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা একটু ভাল ভাবে চলিলে তাহা অন্যের প্রাণে সহ্য হয় না; আপনার অপরের নিকট পাওনা টাকা আছে, কিন্তু অন্যের তাহাতে কোন স্বার্থ নাই, তথাপি সেও ক্ষতি করিতে খুব পটু।

এই যে পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনে প্রায় ১৭॥ লক্ষ লোক আজ ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বিপন্ন, অন্ন-বস্ত্রহীন, গৃহহীন, ধনহীন, আহার্য্য তরকারী বিহীন, এমন কি পানীয় জল বিহীন হইয়াছে, এবং বন্যার সহচরীরূপে কলেরা, বসন্ত, উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি রোগের আবির্ভাব হইয়াছে ও প্রায় প্রতিবৎসর হইতেছে তাহার মূল কারণ কি? খবরের কাগজে তাহাদের করুণ-আর্ত্তনাদের কাহিনী শুনিলে সজ্জনের চক্ষের জলে বক্ষভাসে। আমরা জানিতে পাই যে ১২৯০ সালের পূর্ব্বে বন্যা রাক্ষসীর হাতে পড়িয়া এরূপ প্রাণ ত্যাগ করিতে হইত না। আজ ভারসবাসী বিপন্নের উদ্ধারের জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেছেন, আর্থিক সাহায্যে বিপন্নের সাময়িক উপকার হইতেছে বটে কিন্তু স্থায়ী উপকার কয়জনে করিতেছেন? রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রথমেই মূল কারণ ধরিয়া চিকিৎসা করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে রোগ না হইতে পারে তৎপ্রতীকারও করেন। বাঙ্গলাদেশে বহু পাষণ্ডকে দেখিতে পাওয়া যায় যে—যে মায়ের দুগ্ধের ঋণ শোধ করা যায় না সেই মাকে ভিন্ন করিয়া দেয় এবং নিজে স্ত্রী-পুত্র নিয়া খায় দায় ও মজাকরে। এরূপ স্থানে লোকে হা অন্ন! হা অন্ন! করিবে না তবে কোথায় করিবে? অবশ্য ভারতের কেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চুরি, হিংসা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু তুলাদণ্ডে যখন যে স্থানে এগুলির মাত্রা অধিক হয় তখনই সে স্থানের অধঃপতন হয়।

অহঙ্কার, জিগীষা, মিথ্যা, মদনমোহ, চুরি, ক্রোধ ইত্যাদির এমই আশ্চর্য্য শক্তি যে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, পরকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহা ডাক্তারী পলিক্রেষ্ট ঔষধের ন্যায় কার্য্যকারী। যাহার দেহেতে এগুলি আছে সে মহারাজ হইলেও সুখী হইতে পারিবে না এবং যে স্থানে এগুলির বেশী প্রাদুর্ভাব সে স্থানের অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিলে এ ক্ষুদ্র লেখনীতে বুঝান অসম্ভব। অগ্নিতে গৃহ দগ্ধ হইলে নিকটস্থ গাছপালার যেরূপ অবস্থা হয় ঐ সকল স্থান সমূহেরও প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। যদি আপনি চিরসুখী হইতে চান এবং জগৎকে সুখী করিতে চান তবে অদ্য হইতে উপর্য্যুক্ত কুঅভ্যাসগুলি ত্যাগ করুন, দেখিবেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনি শান্তি পাইবেন; নতুবা চিরদিন অশান্তিতে থাকিবেন। ইহার যে কোন একটি আপনার দেহে যত মাত্রায় থাকিবে প্রায় তত মাত্রায় আপনি অধর্ম্ম অর্জ্জন করিতেছেন। তবে বর্ত্তমানে এগুলি দ্বারা যে সুখ পাইতেছেন তাহা কণ্ডুয়ণ সুখের ন্যায় ক্ষণিক সুখ, তৎপরেই রক্তপাত ও জ্বালা। চিরস্থায়ী সুখ ধর্ম্ম হইতেই সমুদ্ভুত হয়। তাই বলি আগে ধর্ম্ম কি তাহা জান, তারপর তদ্রূপ কার্য্য কর; সঙ্গে সঙ্গে চরকায় তৈল দাও। নতুবা দেশশুদ্ধ লোক তাঁতির কাজ করিলে, বা হিন্দু মুসলমানে জাতিভেদ রহিত করিলে, দেশ উদ্ধার হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা ধর্ম্মের উপর হাত দিয়াছিলেন তাঁহাদেরই পদে পদে অধঃপতন হইয়াছে। বোধ হয় মহারাণী

ভিক্টোরিয়া প্রধানতঃ এই কারণেই কাহারো ধর্ম্মের উপর হাত দেন নাই; কারন তিনি বোধ হয় জানিতেন যে-"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।" ধর্ম্ম ব্যতীত কেবল আসুরিক বল দ্বারা কেহ কখনো ঈশ্বরের দয়া লাভ করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। যদি বল ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম—ধৃঙ্ ধাতু, আর মন্ প্রত্যয়। ধৃঙ্—মানে ধারণ করা, আর মন্ প্রত্যয়ের মানে—মনে, অন্তরে—অর্থাৎ অন্তরে সদ্‌গুণ ধারণ করার নাম ধর্ম্ম। অথবা যাহা না থাকিলে এই সংসার টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যথা—অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব। ধর্ম্মের লক্ষণ শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুনুন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

১। ধৃতি—ধারণ করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি।

২। ক্ষমা—কেহ গালাগালি বা অপমানের কথা বলিলে তাহার উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া শক্তি সত্ত্বেও মার্জ্জনা করা।

৩। দম—বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার।

৪। অস্তেয়—অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা আর প্রতারণা না করা, চুরি বা জুয়াচুরী না করা।

৫। শৌচ—সর্ব্বদা দেহ ও অন্তরেকে পরিষ্কার রাখা।

৬। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—ইন্দ্রিয় বিপথে গমন করিলে তাহা প্রত্যাহরণ করা।

৭। ধী—শান্ত স্বভাব। অর্থাৎ—চিত্তকে স্থির ভাবে রাখা।

৮। বিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান।

৯। সত্য—সর্ব্বদা সত্য কথা ব্যবহার করা।

১০। অক্রোধ—কাহারও প্রতি রাগ না করা।

ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ। যাঁহাদের এই সমস্ত গুণ নাই তাঁহারা মনুষ্য পদবাচ্য নহে। ধার্ম্মিক লোকই জগতে প্রকৃত পক্ষে সুখী। যথায় ধার্ম্মিক লোকের স্থিতি তাহাই পুণ্য তীর্থ নামে অভিহিত, এবং শত শত অধার্ম্মিক তাহা দ্বারা উদ্ধার হইতেছে। ইহা কি কেহ একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ?

"বিদ্যা বিত্তং বপুঃ শৌর্য্যং কুলেজন্মাপ্যরোগিতা।
সংসারচ্ছিত্তি হেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে॥
সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বেঃহি তচ্চ ধর্ম্ম সমুদ্ভবম্।
তস্মার্দ্ধর্ম্মঃ সদাকার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥"

অর্থাৎ—বিদ্যা, বিত্ত, দেহ, শৌর্য্য, শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম, দেহ অরুগ্ন থাকা ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, সকলই ধর্ম্ম হইতে প্রসূত। এ জগতে মানুষ হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই সুখের বাঞ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু এই সুখ ধর্ম্ম হইতেই সমদ্ভুত হয়। অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য যে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া উক্ত প্রণালীতে ধর্ম্মাচরণ করা। মানুষ

না হইয়া স্বরাজ লাভ করিলে দেশের দুর্গতি দূর হইবে না, বরং আরও অধোগতি হইবে। ধর্ম্মরূপ রজ্জুদ্বারা দেশ উদ্ধারের উত্তোলন যন্ত্র বাঁধিতে হইবে, নতুবা অপর যে কোন রজ্জুদ্বারাই বাঁধ না কেন তাহা পাপরূপ মূষিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। Non-Co-operation রূপ জাহাজ যত বড়ই হউক না কেন, অধর্ম্মরূপ প্রবল ঝড়ে তাহা জলধির অতল সলিলে চিরতরে নিমগ্ন হইবে, তাই বলি মনুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হও। জগতে অভ্রান্ত কেহই নহে. কেবল মুনিঋষির বাক্যই অভ্রান্ত, কারণ তাঁহারা ত্রিকালদর্শী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবলে, ধ্যানবলে, যোগবলে, তপোবলে, যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তোমরা নিজ কল্পনায় আজ যাহা যুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, দশদিন পরে তাহাই আবার অযৌক্তিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং একগুয়েমী কোনও কাজে ভাল নয়। যাঁহারা চক্ষুস্মান্ এবং চিন্তাশীল তাঁহারা কখনো নিজে চিন্তা না করিয়া অন্যের দোহাই দিয়া চলেন না। তথা কথিত স্বরাজ বা স্বাধীনতা এই গুলিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হতে পারে না; প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, নিরুদ্বেগ শান্তি—ক্ষণস্থায়ী আনন্দ নহে, যাহাতে পরমুহূর্ত্তে অবসাদ আসে। এমনি শান্তি লাভ করিতে হইবে—যা কখন নষ্ট হইবে না, ভাঙ্গবে না—একেবারে অটুট চিরস্থায়ী ভাবে থাকিবে। স্বরাজ লাভের পরেও যদি পাশ্চাত্য জাতিদের মত আক্রমণ আশঙ্কায়

উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়, তবে এ স্বরাজ বা স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বলে থাকেন তাঁ'রাও এরকমের স্বরাজ পেতে চান না। তাঁরা স্বরাজ শব্দের অর্থ করেন—আত্মশুদ্ধি বা Self—purification নিজের আত্মশুদ্ধির ন্যায় অন্যান্য সকলের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। কারণ প্রতিবেশীর আত্মশুদ্ধি না হইলে, তুমি যতই সাধুতা বা অহিংসানীতি অবলম্বন কর না কেন, সে তোমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেলে কিছুতেই ছেড়ে দিবে না। তার প্রাণ থেকেও দানবীয় ভাব দূর করা তোমার আত্মশুদ্ধিরই অঙ্গীভূত। প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা যখনই যজ্ঞাদি সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনই দানব নিধনের জন্য ক্ষত্রিয় রাজগণের বাহুবলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইতেন। নতুবা ইহাদের উৎপাতে ও উপদ্রবে কোন সৎকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইবার উপায় ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বকল্যাণের জন্য সকল দেশের সকল নর-নারীর প্রাণ থেকে দানবীয় ভাব দূরীভূত করিতে হইবে। Kill not the man, but the devil in him. অর্থাৎ দানবরূপী মানব সংহারের প্রয়োজন নাই, জগত থেকে দানবতা—হিংসা, দ্বেষ ও আক্রোশ একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা বিশ্বের কল্যাণ কামনা করা বৃথা। সত্যযুগের পর হইতে যখনই এগুলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তৎপর হইতেই ক্রমশঃ বিশ্বের অমঙ্গল হইতেছে, দেবতারাও এগুলির হাত হইতে নিস্তার পান নাই। এখন আমরা অমঙ্গলের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছি।

বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অশান্তি নিবারণের যদিও চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি প্রায় অধিকাংশ কর্ম্মচারীদের উৎপাতেই আজ ভারতবাসীর অনেকে অযথা উৎপীড়িত হইতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে কোন প্রজা জমিদারেরর খাজনা না দিলে, জমিদার তখন নায়েবকে আদেশ করেন যে প্রজাকে আমার নিকট হাজির কর, নায়েব প্রভুর আদেশে দ্বারবান্‌কে হুকুম দেন, দ্বারবান লগুড় হস্তে প্রজার বাড়ীতে উপস্থিত হয়, এবং সময় সময় কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া ও প্রজাকে নানারূপ অত্যাচার করিয়া বাঁধিয়া আনিতে ত্রুটি করে না। এস্থলে জমিদারের ত কোন দোষ দেখা যায় না, দ্বারবানেরই অন্যায় অত্যাচার। বর্ত্তমানে দ্বারবানের ন্যায় যে সব রাজকর্ম্মচারী হিংসাপরবশ হইয়া ও অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া অযথা লোকের অর্থক্ষতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করায় তাহা বর্ণনাতীত, ভুক্তভোগী মাত্রেই বিদিত আছেন। বলা বাহুল্য বৃটিশ শাসন বিধান ভারতের জন্য ততটা দুঃখকর নহে—যতটা অশান্তিকর ও অন্যায় ব্যাপার তাঁহাদের প্রিয় কর্ম্মচারীগণ দ্বারা সাধিত হয়। যদিও এসব হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান শূন্য পাষণ্ডেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সচরাচর অপকর্ম্ম হেতু শাস্তি পাইতেছে তথাপি তাহাদের অভ্যাসটুকু যাবে কোথায়? কারণ মানুষ অভ্যাসের দাস, তাহারা সুযোগ পেলে গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত ছাড়ে না। এসব পাষণ্ডকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা না করিলে দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন। পাষণ্ডেরা একবার ভাবিয়া দেখিলেই

পারে যে, সুখ-দুঃখ, অন্ধ-খঞ্জ, কুব্জ-বধির, মূক-কাণা ইত্যাদি কেন হয়? তাহা হইলে সব গোলই মিটিয়া যায়। ইহকাল যখন আছে তখন নিশ্চয়ই পরকাল আছে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও ধ্রুব ও নক্ষত্রলোকের মানুষের ঘরবাড়ী প্রত্যক্ষ করাইতেছে, বোধ হয় পরে চতুর্দ্দশ ভুবনও প্রত্যক্ষ করাইবে এবং প্রেতাত্মা দ্বারাও অসাধ্য সাধন করিতেছে, তখন কি মনে হয় না যে পাষণ্ডেরা ইহার প্রতিক্রিয়া * (Reaction) দ্বারা অভিভূত হইবে?

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, যিনি উপরোক্ত ধর্ম্ম পালন করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন, তিনি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও তাঁহার সেই সংসার স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ, দেবগণও ইহা প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহাকে একেবারেই নিকৃষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। অন্যকে আর কি বলিব, ধর্ম্মের যাঁহারা রক্ষক, ধর্ম্ম যাহাদের ভাবিবার বস্তু, সেই ব্রাহ্মণই অধিকাংশ স্থলে নাস্তিক হইতেছেন। যে শিক্ষায় ধর্ম্মলাভ হয় না সে শিক্ষা কুশিক্ষা জানিও।

শিক্ষা শব্দে কোনরূপ ভাষা শিক্ষা নহে,
ভাষায় পণ্ডিত জনে শিক্ষিত না কহে।
ভাষাবিৎ পণ্ডিত অথচ যে নাস্তিক,
অশিক্ষিত অপেক্ষা সে দুর্দ্দান্ত অধিক।
শিক্ষার অভাবে দুঃখ যত রূপে হয়,
সহস্র বদনে তাহা বর্ণনীয় নয়।

* ঘড়িতে যত জোরে আঘাত হয় প্রতিঘাতটি তারচেয়েও জোরে হয়।

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ ভাষা শিক্ষা ✻ বিনা,
শিক্ষিত কিরূপে হয় বুঝিতে পারি না।
বর্ত্তমানে বিজাতীয় বিধর্ম্মী শাসন,
বিদ্যালয়ে বিদেশীয় ভাষা অধ্যয়ন।
সে ভাষায় উচ্চ শিক্ষা যাহা লাভ হয়,
তোমার বিচারে তাহা যথেষ্ট কি নয়?
ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান সে ভাষায় নাই,
ভারতের ভক্তিযোগ তাহাতে না পাই।
নাহি পাতঞ্জল, নাহি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ,
পরাজিত শত্রুপ্রতি নাহি ভাব শুদ্ধ,
অতএব মনুষ্যত্ব যাহে মোরা পাই,
আমাদের আপনত্ব যাহে না হারাই,
সেই শিক্ষা আমাদের এবে প্রয়োজন,
হেন শিক্ষা যে বিস্তারে সেই নারায়ণ।
সুশিক্ষা কুশিক্ষা আর অশিক্ষা এ তিন,
মনুষ্য সমাজে বিদ্যমান চিরদিন।
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অবনত যারা,
মানুষ হইয়া হীন পশুতুল্য তারা।
মানুষ হইয়া গরু মহিষের মত,
বুদ্ধিমান্ প্রবলের বোঝা টানে কত।

✻ জগতে সর্ব্বসমেত ২৭৫৪ রকমের ভাষা আছে

আপনি আপন হিত বুঝিতে না পারে,
নানা ছলে চতুর ছলিয়া প্রাণে মরে।
ক্ষুধায় আহরি অন্ন কোন রূপে খায়,
লক্ষ্যহীন গুল্ম সম ভাসিয়া বেড়ায়।
স্বভাবে সে দাসত্ব করিতে ভালবাসে,
তাহাকেই প্রভু কহে যে সম্মুখে আসে।
তাই বলি শিক্ষা দানে মুক্ত প্রাণ যারা,
স্বজাতির প্রধান কল্যাণ সাধে তা'রা।
শিক্ষা শব্দে ধর্ম্ম শিক্ষা * শুন মহোদয়,
জীবনে মরণে যাহা শান্তির আলয়।
হেন শিক্ষা মানুষে প্রদান যারা করে,
দ্বিতীয় ঈশ্বর তারা এ ভূতলোপরে।

* ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে সংসারে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হয় তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখুন।

কলিকাতার হাটখোলায় এক ভদ্রগৃহস্থের কুলবধু—পঞ্চদশবর্ষীয়া যমুনাবালা দাসী—কেরোসিনের আগুণে আত্মহত্যা করে। তাহার মৃত্যুকালীন উক্তিতে প্রকাশ পায়, তাহার শ্বাশুড়ী স্বামী ও ননদ তাহাকে দেখিতে পারিত না, তাহার প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার করিত; সেই জন্যই সে আত্মহত্যা করিয়াছে। গত ২রা জুলাই ১৯২৯ ইংরাজীতে কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রায় স্বামী ও শাশুড়ী প্রত্যেকে নয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ননদ অব্যাহতি পাইয়াছে।

বিচার পতি যখন রায় প্রকাশ করেন তখন যমুনাবালার শ্বাশুড়ী ও ননদ পরস্পর পরস্পরের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে—কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না, শেষে অনেক কৌশলে ননদকে ছিনাইয়া লওয়া হয়। স্বামী ও শ্বাশুড়ী শ্রীঘরে প্রেরিত হয়। বালিকা বধূর প্রতি নির্য্যাতন এবং বালিকা বধূর আত্মহত্যার ঘটনা বর্ত্তমানে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? ধর্ম্মভাবের অভাবই এই সকল দুর্ঘটনার একমাত্র কারণ। এখন পিতা মাতাও ধর্ম্মপ্রাণ নহেন। পিতামাতা ধর্ম্মপ্রাণ হইলে এরূপ দুর্ঘটনা হইত না। তাঁহারা ছেলে মেয়েকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন না। পক্ষান্তরে শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও স্বামীর প্রাণে—যদি ধর্ম্মভাব জাগরূক থাকিত, তাঁহারা যদি বালিকা বধূকে আপনার গৃহে লক্ষ্মী বলিয়া আদর করিতে পারিতেন; তাহা হইলে আর এরূপ দুরবস্থা হইত না। হিন্দুর চিরন্তন শিক্ষা লোপ পাইয়াছে; তাই দেশে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে বসিয়াছে। জানিনা আবার কত দিনে সেই সনাতন শিক্ষা এদেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে।

রাজসাহী মধ্যে গ্রাম নামে কাপাসিয়া;
(নাটোরে নামি হাঁটি যাইবে পুটিয়া,
পুটিয়া নিকটে গ্রাম) রাজসাহী মুখে;
রাস্তা আছে পান্থ যাহে হাঁটে মন সুখে।
এই রাস্তা মধ্যে আছে পোল বাণেশ্বর,
শ্মশান যাহার নীচে, চৌদিকে প্রান্তর।

দুর্গাদাস নাম তার, সন্তান সুজন,
কাপাসিয়া গ্রামবাসী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ।
একমাত্র কন্যা তার নাম কালিদাসী,
পরম লাবণ্যময়ী বয়সে ষোড়শী।
পত্নী তার ভক্তিমতী সেও দুর্গাদাসী,
স্বভাবে প্রশংসা করে সর্ব্ব গ্রাম বাসী।
ভজহরি নামে ছিল ভৃত্য এক জন,
বাল্যকাল হ'তে যাকে করিল পালন।
আপন সন্তান তুল্য গণে দুর্গাদাস,
তারপ্রতি সকলের অটল বিশ্বাস।
দশক্রোশ দূরে দুর্গাদাসী পিত্রালয়,
হইল পিতার তার আসন্ন সময়।
সংবাদ আসিল, যবে বেলা অবসান,
শুনিয়া বিষাদে তার অবসন্ন প্রাণ।
দুর্গাদাস গৃহে নাই কি হবে উপায়,
দুর্গাবলি নেত্রনীরে বদন ভাসায়।
পিতার সে একমাত্র কন্যা মমতার,
মরণ সময় দেখা না ঘটিল আর।
অনুতাপ অন্তরে জাগিবে আমরণ,
বিষম হইবে তার জীবন ধারণ।
সুন্দর গরুর গাড়ী আছে আপনার,
ভৃত্য ভজহরি আছে বিশ্বাসী অপার।

বিচারী সিদ্ধান্ত মনে করিল তখন,
"অবশ্য যাইব আমি পিতার ভবন।
ভজহরি সঙ্গে যাবে গাড়ী চালাইয়া,
কালিদাসী সঙ্গে রবে নির্ভয় হইয়া,
মাত্র দশক্রোশ পথ যাইব চলিয়া,
প্রভাত না হ'তে মোরা পঁহুছিব গিয়া।"
এত চিন্তি মায়ে ঝিয়ে করি আয়োজন,
ভজহরি সঙ্গে করে গাড়ী আরোহণ।
যাত্রাকালে দুর্গানাম জপি দশবার,
দশবার মণ্ডপে প্রণাম করি আর,
শালগ্রামচক্র নাম লক্ষ্মীনারায়ণ,
করে তার মন্দিরে প্রণাম দুইজন।
বয়সে সম্পর্কে যারা ছিল গুরুজন,
তা সবার পদরেণু মস্তকে স্থাপন
করিয়া সন্ধ্যার কালে হইল বাহির,
বিষণ্ণ অন্তর দোঁহে সংশয়ে অস্থির।
উপস্থিত হয় যবে বিপদ সময়,
তখন যেরূপ ভক্তি মনে উপজয়,
তার সাক্ষী হের যবে কলেরা লাগিবে,
গ্রামের সমস্ত লোক একত্রে মিলিবে।
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হবে একমন,
আরম্ভ করিবে কালী অর্চ্চনা তখন।

সঙ্কটে পড়িয়া তথা একাগ্র অন্তরে.
দুর্গতি নাশিনী নাম দোঁহে জপ করে।
ডাকার মতন যদি ডাক একবার,
একডাকে হবে তবে শক্তি অবতার।
প্রহ্লাদের একডাকে নরসিংহ হরি,
ধ্রুবডাকে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধরি।
যখনি ডাকিবে ভক্তে অর্পি মন প্রাণ,
তখনি দেখিবে কৃপা রূপে বিদ্যমান।
নারীর স্বভাব এই শুন মহাশয়,
পিতৃগৃহ নামে মত্ত সমস্ত সময়।
মায়ে ঝিয়ে করে যবে গাড়ী আরোহণ,
সঙ্গে নিল সহস্র মুদ্রার আভরণ।
লোভের আশ্চর্য্য শক্তি শুন মহাশয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধি ইথে কিছু নাহি রয়।
লোভের আক্রমে লোক যবে মত্ত হয়,
দেবতার চিত্ত হয় অসুরতা ময়।
অর্থলোভে করে লোকে সন্তান বিক্রয়,
অর্থ সনে সতীত্বের হয় বিনিময়।
পিতৃ হত্যা করে নর অর্থের আশায়
শিষ্য হত্যা করে গুরু * *
অর্থের কারণে নরে সন্যাসী সাজিয়া,
মাদুলীর ফেরী করি বেড়ায় ঘুরিয়া।

অর্থ লোভে হয় নর নিষ্ঠুর দুর্জ্জন,
রাক্ষসের মত করে পরস্ব লুণ্ঠন।
অর্থলোভে চুরি করি ভোগে কারাবাস,
পত্নী হয়ে দেখে নিজ পতির বিনাশ।
এমনি লোভের কর্ম্ম শুন মহাজন,
হেন লোভে মুগ্ধ আজি ভজহরি মন।
মনে ভাবে আজি বটে এক শুভ দিন,
সুযোগ ছাড়িলে আর পাওয়া সুকঠিন।
অলঙ্কার হাজার টাকার অন্য আরে
একত্র করিলে পাব পৌনে দুহাজারে;
মাত্র দুই টাকা আমি মাসে মাসে পাই,
কুড়ী জন্ম খাটিলেও কুড়ী টাকা নাই।
কিন্তু আজ যদি দোঁহে মারিয়া ফেলাই,
পৌনে দুহাজার টাকা এক চোটে পাই,
কে আর ধরিবে নবদ্বীপে চলি যাব,
চুপি চাপি ছোট এক আখেড়া বানাব।
ভেক লব, সাধু হব, মাথা মুড়াইয়া,
সেবাদাসী দুইজন করিব বাছিয়া।
আনন্দে করিব শেষে জীবনাবসান,
ভাগ্যবান কে রহিবে আমার সমান।
এই ত প্রকাণ্ড মাঠ তাহে রাত্রিকাল,
কে জানিবে কে শুনিবে না হবে জঞ্জাল।

ইহারা দুর্ব্বলা আমি পূর্ণ বলবান,
বিনাশ করিব দোঁহে মক্ষিকা সমান।
এমন সময় গাড়ী করিয়া ঘর্ঘর,
উপস্থিত হ'ল যথা পোল বাণেশ্বর।
দক্ষিণে শ্মশান ঘাট বামে ময়দান,
রাস্তা ছাড়ি বামে ভজা হয়ে আগুয়ান।
যখন ছাড়িয়া রাস্তা ভজহরি যায়,
দুর্গাদাসী তার ঠাঁই কারণ সুধায়,
নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করি কহে ভজহরি,
ক্ষণৈক বিলম্ব কর দেখ যাহা করি।
হত্যা করি তোমা দোঁহে লব অলঙ্কার,
দুটাকার ভৃত্যাগিরি না করিব আর।
দুর্গাদাসী শুনি ভয়ে বিস্ময় মানিল,
"দুর্গে রক্ষা কর" বলি কাঁদিতে লাগিল,
কৃতঘ্ন নির্দ্দয় ভজা গোরজ্জু বন্ধনে,
হস্তপদ এক করি বাঁধিল দুজনে।
মায়ে ঝিয়ে যবে দুষ্ট বাঁধিতে লাগিল,
কাতরে সে দুর্গাদাসী নিষ্ঠুরে কহিল।
"রে পাষণ্ড! ভৃত্য তুই পুত্রের সমান,
রাক্ষসের মত আজ বিনাশিবি প্রাণ!
আছে ধর্ম্ম, আছে দেব শক্তি চরাচরে,
আছে সত্য আছে কর্ম্মফল ভাগ্যোপরে।

সর্ব্বদর্শী ভগবান, কেমনে লুকাবি
দৃষ্টি তাঁর ? রে পামর! কিসে এড়াইবি
হেন পাপ কর্ম্ম সাজা ? না ভাবিস্ মনে
তরিবি তস্কর তুই ধর্ম্মের সদনে!
বিশ্বাস করিনু তোরে পুত্রের সমান,
তার ফলে রে নিষ্ঠুর বিনাশিলি প্রাণ ?
আত্মরক্ষা শক্তিহীনা অসহায়া মোরা,
নির্জ্জন প্রান্তর তাহে অন্ধকারে ঘেরা।
না ভাবিস্ ? তবু হত্যা করিবি গোপনে,
সর্ব্বত্র দর্শিনী দুর্গা আছে মোর সনে।
ত্রিনয়না করালবদনা মহাকালী,
অন্য নাম পাষণ্ডঘাতিনী মুণ্ডমালী।
তাঁর করে সঞ্চিল কঠোর দণ্ড তোর,
তারপরে আছে গৃহে পতি মিত্র মোর;
নিস্তার না পাবি তুই তাহাদের করে,
—কুকুর! পাবিনা রক্ষা ব্যাঘ্রের নখরে।
কর যাহা অভিরুচি কিন্তু রে পিশাচ!
করিতেছে তোর কাছে এ মিনতি আজ,
হর প্রাণ একাঘাতে না দিয়া যন্ত্রণা,
—দুর্গাদাসী নাহি করে মৃত্যুর ভাবনা!
বহু যত্নে রে বর্ব্বর! বহুদিন তোরে
পানাহার দিয়াছিনু পুত্র-নির্ব্বিশেষে,

প্রার্থি এবে এইমাত্র প্রতিদান তার।”

শুনি দুষ্ট নরাধম অতি হৃষ্ট মনে,

অন্বেষণে দৃঢ় বাঁশ ভীষণ শ্মশানে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক করি নিরীক্ষণ

যেমন আনন্দে তাহা করে উত্তোলন,

ভয়ঙ্কর কালসর্পে বেষ্টিল তাহায়,

তিষ্ঠিতে না দিল দুষ্টে শুনিতে বিস্ময়।

এক সর্প উঠি তার বাঁধিল চরণ,

বংশসহ করে কর দ্বিতীয়ে বন্ধন;

উঠিল তৃতীয় তার মস্তক উপরে,

বিস্তারিল কালফণা দংশিতে ললাটে।

বদ্ধ পাপী সর্পজালে যেন কালপাশে,

আবদ্ধ কুকর্ম্মী জীব মৃত্যুর আবাসে।

চীৎকারিল প্রাণ ভয়ে দুর্ম্মতি অসৎ,

সারারাত্রি হতবুদ্ধি ভাবি ভবিষ্যৎ।

পোহাইল কালরাত্রি ভীষণ শ্মশানে,

কৃষক সকর্ম্ম হেতু বাহিরিল মাঠে।

নিরখিল সর্ব্বজন দুর্দ্দশা তাহার,

নিরখিল কৃতঘ্নের শাস্তি কি প্রকার,

নিরখিল আছে ধর্ম্ম, আছে ধর্ম্মপাল

আছে সত্য, আছে ন্যায়, আছে প্রতিফল। *

* গোরজ্জুর পরিবর্ত্তে সর্প রজ্জু।

আছে রক্ষাকালী, কালভয় বিনাশিনী,
দুষ্ট চূর্ণকারিণী মা দুর্জ্জন-ত্রাসিনী।
নাটোর হইতে চারি বন্দিকে লইয়া,
পুলিস যাইতেছিল সে পথ বাহিয়া।
রাত্রিশেষে উপস্থিত যথা বাণেশ্বর,
গাড়ী মধ্যে শুনে যেন মৃদু আর্ত্তস্বর।
নিকটে যাইল ধীরে দেখে দু'জনার,
হস্ত পদ রজ্জুবদ্ধ আশ্চর্য্য ব্যাপার।
বন্ধন খুলিয়া দিল আশ্বাসিল আর,
শিস্ট বাক্যে জিজ্ঞাসিল আর্ত্তি সমাচার।
কন্যা তবে যথা সত্য করিল বর্ণন,
পুলিশের লোকে শুনি করে অন্বেষণ।
প্রভাতে শ্মশান ঘাটে হ'ল উপনীত,
দেখে ভজা সর্পজালে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত।
দারোগা আসিতে হল বেলা দ্বিপ্রহর,
সে পর্য্যন্ত তাকে না ছাড়িল বিষধর।
দুর্গাদাসী পতি মিত্র আসিল ধাইয়া,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে সতী কাঁদিল ধরিয়া।
দেখিতে পাপীর দণ্ড, অগণ্য মানব,
প্রান্তরে আসিল ধেয়ে করি উচ্চরব।
—অর্দ্ধোদয় যোগে যেন জাহ্নবীর জলে,
উপস্থিত যাত্রীকুল মহা কোলাহলে!

সহিয়া সর্পের ভার শুনিয়া গর্জ্জন,
অর্দ্ধমৃত প্রায় দুষ্ট কৃতঘ্ন দুর্জ্জন।
সম্বোধিল কালকুলে রাজকর্ম্মচারী,
"ইচ্ছা হয় দেহ শাস্তি কিম্বা দেহছাড়ী।
আছে ধর্ম্ম রাজাসন লইব তথায়,
যথাযোগ্য দণ্ড তথা পাবে দুরাশয়।"
শুনি সর্প ত্যজি দুষ্টে নিজস্থানে যায়,
হাতে গলে রাজকর্ম্মী বাঁধি নিল তায়।
দণ্ডিল পাষণ্ডে সপ্তবর্ষ কারাবাসে,
সমস্ত সংবাদ পত্র এ তত্ত্ব প্রকাশে। ১
করুণার নিদর্শন কি বলিব আর,
অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে তাঁর মহিমার।
যে ভাবে যেজন ভজে ভক্তি যদি থাকে,
মহাশক্তি আবির্ভূতা হন এক ডাকে।
ভক্তের দুর্গতি নাশ স্বভাব তাঁহার,
দুর্গা দুর্গা মুখে সবে বল অনিবার।

১। ১২৮৩ সালে এই ঘটনা ঘটে। রাজসাগর জজকোর্টে প্রথমতঃ ফাঁসীর হুকুম হয়, পরে হাইকোর্ট আপীলে ৭ বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়, হাইকোর্ট বলেন ফাঁসীর যোগ্য হইলে সাপেই তাহার ব্যবস্থা করিত। সাপে যখন প্রাণদণ্ড করে নাই তখন কারাবাসই যোগ্য দণ্ড। খুলনা জিলায় যখন প্রায় এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে তখন পুলিস তাহাকে সঙ্গে নিয়া সমস্ত সহরে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং বলিত এখনো ধর্ম্ম আছে, এখনো ধর্ম্ম আছে।

শান্তি সুখ যে চাও সে হও ভক্ত জন,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হও ধনী বা নির্ধন।

জিজ্ঞাসু—মানব অদৃষ্টের দোষ দেয় কেন?

বক্তা—আপনার কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধন মরে,
শ্রীকৃষ্ণের চক্র বলি ব্যাখ্যা করে নরে।
পুত্র শোক দিয়া রাজা পুত্র সুখ পায়,
অদৃষ্ট কি আছে ইথে দৃষ্টি করা দায়।
কর্ম্ম করি প্রাপ্ত হই ফল অনুরূপ,
তথাপি সতর্ক নই এই অপরূপ।
পড়ি নাই, পরীক্ষায় পারি নাই তাই,
অসন্তুষ্ট অতিশয় পিতা মাতা ভাই,
কি দিব প্রবোধ কিছু না পাই ভাবিয়া,
অদৃষ্টের দোষ দিয়া বেড়াই কাঁদিয়া
এ সকলে ভুলিবে না বিধাতা যে জন,
শ্রীকুমায় সতর্ক হও করিয়া শ্রবণ।

বর্ত্তমানে যে অধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছি তাহার মূল কারণ হইতেছে, আধুনিক শিক্ষা, দ্বিতীয়টি অভাব। বাল্যকালে আমরা যেরূপ শিক্ষা পাই তদনুরূপই গঠিত হইয়া থাকি। অভ্যাস বশতঃ স্বভাব, স্বভাব বশতঃ কর্ম্ম এবং কর্ম্মবশেই জীবগণের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ভক্তি,

মুক্তি সমস্তই সংঘটিত হয়। যদি ইহা না হয় তবে জগৎপিতা পক্ষপাত সূত্রে একের প্রতি অনুগ্রহ, অন্যের প্রতি নিগ্রহ, প্রকাশ করিতেছেন কেন? অতএব অভ্যাসই স্বভাব এবং কর্ম্মের জনক। ইংরাজীতে বলে—Home makes the man অর্থাৎ পারিবারিক শিক্ষাই শিশুকে মনুষ্যত্বে বা পশুত্বে পৌঁছিবার পথ করিয়া দেয়। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন যে—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্ম ফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।

অর্থাৎ—ঈশ্বর লোকের কর্ত্তৃত্ব সৃজন করেন না, কর্ম্ম সৃজন করেন না এবং কর্ম্মফলের সংযোগও সৃজন করেন না, স্বভাব হইতেই ইহা প্রবর্ত্তিত হয়।

এই যে অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন শাস্ত্রে আছে—

"বরং দারিদ্র্যমন্যায় প্রভবাদ্ বিভবাদপি।
ক্ষীণতাপিহিতা দেহে পীনতা নতু রোগজা॥"

অর্থাৎ—বরং দরিদ্র হইয়াও দুঃখে থাকা ভাল তথাপি অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নয়। যেমন সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল তত্রাচ রোগে ফুলিয়া মোটা হওয়া ভাল নয়।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ—মানবের ধর্ম্মই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলে ইহা আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সকলই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়।

হে নব্য শিক্ষিত ভারতবাসি! তোমরা শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইলেও বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ মিডিয়াম, ক্রিষ্টেল গেজিং, ছায়াপুরুষ, যোগনিদ্রা, Hypnosis, Clairvoyance, Illusion, ইত্যাদির সাহায্যে প্রেতাত্মা আনয়ন্ পূর্ব্বক অধর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ ভাবে ঐসকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে সত্বরই মৃতব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ আপ্যায়িত করা চলিবে। হুগলি জেলায় শ্রীরামপুরের নিকট রিস্‌ড়ে গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন। হরিদ্বারে তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সাধারণ স্ত্রীলোকের স্থায় পূর্ব্বদেহে কথা বলিয়াছিলেন। এরূপ বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতে কেন বিলাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেততত্ত্ববিৎ মিরহামিদ ও অলকট্ সাহেব কলিকাতায় তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা যে কোন মৃত ব্যক্তির ফটো তুলিতে পারেন, তাছাড়া প্রেতাত্মার সঙ্গে বাক্যালাপও করাইতে পারেন। এরূপ প্রেততত্ত্ববিৎ ভারতে বহু আছেন। এসব দেখিয়া শুনিয়াও যে অধিকাংশের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। প্রেতাত্মাদ্বারা যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই—বহু লোককে হিংসা করিয়াছিলাম, তজ্জন্ম ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অবিরত চারিদিক হইতে যেন অগ্নি আসিয়া দগ্ধ করিতেছে; তাহার ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। কেহ কেহ

বলিতেছে লোককে নানা মত যাতনা দিয়াছি, তজ্জন্য অহরহঃ বিষের জ্বালায় মহা কষ্ট পাইতেছি। কেহ কেহ বলিয়াছে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম তজ্জন্য দুইশত বৎসর হইতে জিহ্বা অগ্নির কয়লার ন্যায় দগ্ধ হইতেছে, কেহ কেহ বলিতেছে অহঙ্কারে লোককে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিলাম, তাই তৃণবৎ শরীর হইয়া ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতেছি। যাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে তাহারা বলিতেছে জীবিত অবস্থায় যত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম তাহার শতগুণ কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কি বলিব। যাঁহারা নরক বাসের ছবি দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন পরজগতে অধর্ম্মের শেষ পরিণাম ঐরূপই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিয়াও জীবন দু'দণ্ডের জন্য ও আত্মা অবিনাশী এ কথায় মনুষ্য বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। মিডিয়ামে বহু প্রেতাত্মা স্ব স্ব দুষ্কৃতির জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে; ইহা দেখিলে কার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদে বোধ হয় পাষাণ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ হইতে প্রেতাত্মা যে সব পারলৌকিক কথা বলিয়াছে তাহা প্রায় সহস্র বৈজ্ঞানিক ও বিশহাজার পণ্ডিত মণ্ডলী অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আহা! জ্ঞানীলোকের কথা আর কি বলিব, যাঁহারা আত্মতত্ত্ব (Egoism) বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা পরজগতে আত্মার সুখ দুঃখ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেছেন এবং বহুতর সভাসমিতি ও পুস্তক প্রচার দ্বারা নিদ্রিত

ভারতবাসীর কর্ণকুহরে অধ্যাত্মতত্ত্বের বীজ বপন করিতেছেন। ইহা দেখিয়াও যে ভারতবাসীর এখনও চেতনা হইতেছে না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মার কিরূপ অবস্থা হয় তাহা দেখিবার ও বুঝিবার উপায় পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ হইবে। বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে নিকটস্থ কলেজ প্রফেসারের নিকট অথবা "সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটীতেও" বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। তা ছাড়া ২।৩ খানা মাসিক পত্রিকা ও ইংরাজী বাঙ্গলাতে প্রায় শতেক গ্রন্থ আছে। (See myer's Human Personality and the other side of the death By C. W. Leadbeater)

এ তো গেল পরজগতে অধর্ম্মের পরিণাম। এখন জীবিত অবস্থায় অধর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করুণ। মৃত্যু সময়ে ক্লেশ কি? অহো! তাহা সুস্থ শরীরে স্মরণ করিলেও ব্যাকুল হইতে হয়। প্রাণ যখন বহির্গত হয় তখন মুমূর্ষুর ক্লেশ নিতান্ত ভীষণ। প্রাণে কত যাতনা হয়, মুখে বলিতে পারে না, জিহ্বা রসশূন্য হইয়া বিকৃত ভাবে আড়ষ্ট হইয়া যায়; কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না—সকল যাতনা বুঝিতে পারে, হস্তাদি সঞ্চালন করিতে পারে না—কিছুই বলিয়াও জানাইতে পারে না, যাতনায় অস্থির হইয়া মস্তক ঠিক রাখিতে পারে না—শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ, যখন কথা আইসে তখন বলে আমাকে ঐ গৃহে লইয়া যাও—কখন বহু প্রকার প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করে, মৃত্যুতে আরও কত যাতনা। নড়িবার ইচ্ছা

হইলেও নড়িতে পারিব না। এখন উদর একটু স্ফীত হইলে শ্বাস টানিতে কত ক্লেশ হয়, আর তখন? এখন বক্ষে কফ জন্মিলে কত ক্লেশ হয়, আর তখন? কত ছট্ ফট্ করিতে হইবে জ্ঞানীরা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আত্মীয় স্বজন নিকটে গেলেও বিরক্ত হয়। কোন কথা কহিতে গেলে 'বেজার' বোধ করে। ঘোর সংসারীও মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে টাকা দেখিতে পারে না—টাকার কথায় তৃপ্তি পায় না, সংসারের কথা বিষয় সম্পত্তির কথা কহিতে চায় না। হরি হরি এ দৃশ্য ত দেখা যায় না। হায়! তথাপি মানব শেষের যাতনা চিন্তা করিয়া সংসার হইতে—জরা মরণ হইতে—মুক্তিলাভের চেষ্টা করে না।

নির্ব্বাণ কালে দীপ শিখার মত যখন শেষ আলোক জ্বলিয়া উঠে তখন পাপী বড় আকুলিত হইয়া একবার চারিদিকে অবলোকন করে—নিজের দুষ্কৃতি সমূহ মূর্ত্তি ধরিয়া, বিকট আকার ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়—উপরে যাইবার পথ না পাইয়া পাপী জীব, তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিঃশব্দে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, চোরের মত নিম্নপথ দিয়া বাহির হয়। অর্থাৎ গুহ্যদ্বার দিয়া প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে নবদ্বারের যে কোন দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে পারে। পাপী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভয়ে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিয়া ফেলে। তোমার যে মৃত্যুকালে ইহা হইবে না তাহা পরীক্ষা করিয়া

লও। হায়! চিত্ত এখন দিন থাকিতে একবার এই বিষয় বিশেষরূপ আলোচনা কর। শেষ সময়ে কেহই সঙ্গে যাইবে না, চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমন করিবার যে সাথী হইবে তাহাকে বর্ত্তমানে সঙ্গে কর।

যাঁহারা সাধক (ভক্ত) যাঁহাদের ইহ ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি আছে, তাঁহাদের শেষ মুহূর্ত্তে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা একবার আলোক প্রদান করে, তখন পুণ্যবান্ শতজন্মের কর্ম্ম ও হাস্যময়ী বরাভয় প্রদায়িনী—আত্মহৃদয় বাসিনীকে দেখিতে পান এবং হাসিতে হাসিতে যাঁহাকে পাইবাব জন্য দৃঢ় ভাবনা তাঁহারই ক্রোড়ে গমন করেন। 'যা মতিঃ সা গতিঃ।'

মৃত্যুকালে চক্ষের জলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখুন। ডুমকা জিলার অন্তর্গত ক্ষমতারায় শ্রীযুত বাবু রামসেবক সিং বর্ত্তমানে কোর্ট সাবনেস্পেক্টার, ইনি পূর্ব্বে দারোগা ছিলেন, জাতিতে ক্ষত্রিয়, বিশেসতঃ তাহার উপর পুলিসের কাজ, সোণায় সোহাগার ন্যায় হইয়াছে। তাঁহার জীবনে গত ১৯১৮ ইংরাজীর মে মাসে যে ঘটনা ঘটে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। কোন কারণে তাঁহার হঠাৎ অচৈতন্যের মত হয়, তৎপর সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও প্রলাপ, শরীর একেবারে ঠাণ্ডা, বাঁচিবার আশা নাই, তখন তিনি নিকটস্থ সিপাহীকে বলিয়াছিলেন যে আমাকে এখানে দাহ করিও না, বাড়ীতে পিতামাতার নিকট লইয়া যাইও। সিপাহীরা তাঁহার শরীর গরম রাখিবার জন্য তখন কম্বল দ্বারা সেক দিতেছিল ও ডাক্তার আনার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

এদিকে তাঁহার এ অজ্ঞান অবস্থায় হঠাৎ খবরের কাগজের ন্যায় দুপিট সাদা একখানা কাগজ চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, দেখিতে দেখিতে কাগজ খানার একদিকে লিখা হইল Good work, সুকর্ম্ম, আর অন্যদিকে Bad work, কুকর্ম্ম। সুকর্ম্মের নীচে দেখিলেন Nil কিছুই নাই, কিন্তু কুকর্ম্মের নীচে জীবনের যত অতীত ঘটনা তাহা লিখা আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা আসে এবং তিনি ভয়ে কাঁদিতে থাকেন; তৎপর হঠাৎ ঐ কাগজের লিখাগুলি মুছিয়া গিয়া পুনরায় একদিকে লিখা হইল 'Poisoning' অন্যদিকে লিখা হইল 'Medicine—Vomiting' যেই তাঁহার নজর ভমিটিংএর দিকে পড়িল অমনি বমি হইয়া গেল, ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ বোধ করিলেন। ডাক্তার যদিও পরে আসিয়াছিলেন তথাপি ঔষধ ব্যবহারের দরকার হয় নাই। এই দুর্ঘটনার পর হইতে তাঁহার যেরূপ ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়াছে তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার নিকট বর্ত্তমানে প্রার্থী গেলে ফেরত ত হয়ই না, তা'ছাড়া তিনি যদি বুঝিতে পারেন ঐ লোক প্রার্থী তাহা হইলে অর্থ হাতে না থাকিলেও ধার করিয়া দিয়া থাকেন। অনেকে মৃত্যু সময়ের অশ্রু ও মলমূত্র অন্যরূপ ধারণা করেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত ধারণা। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, ছোট ছেলেমেয়েরা গুরুজনকে ভয় করিয়া সময় সময় মলমূত্র ত্যাগ করে। পাপীও যমরাজার ভয়ে ঐরূপ করিয়া থাকে। ইহা অতি সত্য ঘটনা, প্রমাণ এখনও পাওয়া যাইবে।

পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ—যে কোন জাতির বা নিজের উন্নতি ও অবনতির বিষয় চিন্তা করিলে এই সত্যটি প্রতিভাত হইবে। একমাত্র পুণ্যের প্রভাবেই যে ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, একমাত্র পাপের কুফলেই যে আজ অপর সকল জাতির পদানত তাহা কি কাহারও বুঝিবার বাকি আছে? শাস্ত্রেও আছে—

দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং।
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ॥
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং।
শ্রদ্দধানশ্চ দান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ। (মহাভারত)

অর্থাৎ—দরিদ্র* পাপাচারী ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। ধনী, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্‌, পুণ্যাচারী ব্যক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে গমন করেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—কেন? ইহলোকেত অনেকে পাপাচরণ করিয়া সুখী হইতে দেখিলাম। তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে চাই 'যাহাদিগকে বাহিরে সুখী বলিয়া মনে করিতেছ, একবার তাহাদের অন্তরে সুখ আছে কি না অনুসন্ধান

---

* ভীষ্মদেব পাপীকে দরিদ্র এবং পুণ্যবানকে ধনী আখ্যা দিয়াছেন। পুণ্যাত্মার কোন বিষয়ে অভাব নাই, মনে সর্ব্বদাই সন্তোষ বিরাজমান, তাই তিনি প্রকৃত ধনী। আর পাপাচারী ব্যক্তি সম্রাট্‌ হইলেও তৃষ্ণাপীড়িত, তাই দরিদ্র, এবং চারিদিকে কেবল অভাব।

করিয়া দেখ—পাপ করিয়া প্রাণের শান্তিতে আছে এমন একটি প্রাণীও পৃথিবীতে দেখাইতে পারিবে না।

সুখ সুখ করি নর ব্যস্ত এ ধরায়,
বোঝে না যথার্থ সুখ কিসে পাওয়া যায়।
উচ্চ সুখ পরি হরি, তোমরা সকলে,
তুচ্ছ সুখে সর্ব্বদা ভ্রমিছ ধরাতলে।
তুচ্ছমান ছাড়ি নিত্য উচ্চমান পাও,
যাচি কেহ ভোগ দিলে অবহেলি যাও।

তোমাদিগে সাধকেরা দুঃখী ভাবে মনে,
আর ভাবে এত দুঃখ সহ বা কেমনে!
কিন্তু যে সুখের সিন্ধু অন্তরে তোমার,
কদাচিৎ ঘটে তাহা ভাগ্যে দেবতার,
ব্রহ্মচর্য্যে যত সুখ নহে বর্ণনার,
—ব্রহ্মচারী তুমি জান সংবাদ তাহার।
হেন ব্রহ্মচর্য্য-পরা বিধবা রমণী
তাহার পরশে ধন্যা হন সুরধুনী।

যথার্থ যে সুখ তাহা ধর্ম্ম আচরণে,
ভগবানে ভক্তি আর তত্ত্ব-আলোচনে।
অতএব ভোগাকাঙ্ক্ষা করি পরিহার,
ধর্ম্ম পথে মতি যার উচ্চ সুখ তার।
ভোগাকাঙ্ক্ষা যার যত তার তত দুঃখ,
তাই লক্ষ্মীমান সদা বিষয়ে বিমুখ।

... বিষয়ে নিবৃত্তি যত যাহার ঘটিবে,
সুখময়ী শক্তি-তত্ত্ব সে তত বুঝিবে।
এমন যে সুখময় ধর্ম্ম আচরণ,
মানব মাত্রের ইহা প্রকৃষ্ট সাধন।

—:*:—

যে যে কর্ম্ম করিলে কেবল পাপ নাশ হইবে বলিয়া বিধিবাক্য পাওয়া যায় ঐ সকল কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে তিন প্রকার পাপের উল্লেখ আছে যথা—মানসিক পাপে মানসিক কষ্ট, বাচনিক পাপে বাচনিক কষ্ট ও কায়িক পাপে শারীরিক কষ্ট ভোগ হয়। অর্থাৎ—"যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল" আবার এই তিন শ্রেণীর পাপ দশবিধ। যথা—

মানসিক	বাচনিক	কায়িক
পরদ্রব্যে লোভ	মিথ্যাভিনিবেশ	হিংসা
পরের অনিষ্ট চিন্তা	অপ্রিয় ভাষণ	স্তেয়,
অনিত্য চিন্তা	অসম্বন্ধ প্রলাপ	পরদার।
	খলতা	

"আত্মজ্ঞানস্য জীবানাং ফলং কর্ম্মক্ষয়োভবেৎ।"

আত্মজ্ঞানের ফল সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ। শ্রীভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে আছে—হে অর্জ্জুন প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করিতেছে ঐরূপ জ্ঞানাগ্নিও জীবের সঞ্চিত কর্ম্মরাশির নাশ করিয়া থাকে ... হেতু সঞ্চিত কর্ম্মের নাশকে

আত্মজ্ঞানের ফল বলিয়া উল্লেখ করিলাম। যাহাদের পাপকার্য্য স্বভাবগত হইয়াছে তাঁহাদের মৃতুচিন্তার ন্যায় এমন মহোপকারী ঔষধ অতি কম আছে। মৃত্যুচিন্তার নামে সকল প্রকার পাপেরই আস্ফালন থামিয়া যায়। দ্বিতীয়ত ধার্ম্মিক লোকের সহবাস ও তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা পাপ দমনের বিশেষ সহায়ক। তৃতীয়ত কালক্ষয়, অনুতাপ, তপস্যা, বেদপাঠ, দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, স্বস্ত্যয়ণ, আর গ্রহশান্তি করিয়া পাপীব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে গ্রহশান্তি হয় আর গ্রহশান্তির কারণই বা কি ?

বক্তা—ভারতসম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ আমাদের কর্ম্মানুযায়ী সুখ ও দুঃখ দিবার জন্য যেরূপ বিভিন্ন ভাবের রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপই জগৎপিতা আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুযায়ী সুখ ও দুঃখ দিবার জন্য নবগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবের আধিব্যাধিই বলুন আর রোগ, শোক দারিদ্র্য বা অশান্তিই বলুন সকল রকম জ্বালা যন্ত্রণাই গ্রহবৈগুণ্যরূপ নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয়। গ্রহগণ তুষ্ট হইলে সুমতি, সৌভাগ্য ও ধনলাভ হয়। আর্থিক মানসিক ও শারীরিক সর্ব্বপ্রকার অশান্তি দূরীভূত হইয়া সুখ, স্বচ্ছলতা, উন্নতি, অর্থাগম ও যশোলাভ হয় এবং প্রাণঘাতী ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

হে নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী, আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন ইহা ধ্রুব সত্য যে গ্রহনক্ষত্রের সন্নিবেশ হইতে ধরার নরনারীর সুখ দুঃখের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় * কিন্তু এই সন্নিবেশের মূল কারণ স্বকৃত কর্ম্ম সংস্কার বলিয়া কর্ম্মকেই সুখ দুঃখের নিদান বলা হইয়া থাকে। জাতকের জন্ম গ্রহণের সময় জন্মান্তরীন কর্ম্ম বশতঃ তাহার উপরে গ্রহনক্ষত্রের যে প্রকার দৃষ্টি পতিত হয়, তদনুসারে কাহারো সুখ কাহারো বা দুঃখের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমরা নিজ নিজ কর্ম্মদোষেই নানারূপ দুঃখ ভোগ করি। সেই সমস্ত দুঃখ ভোগের শান্তির জন্য জগৎপিতা নানারূপ উপায়ও সৃষ্টি করিয়াছেন। হায়! অনেকে জানিয়া শুনিয়াও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চেষ্ট আছেন। বিশেষতঃ অনেকের ধারণাও আছে—বিধিলিপি খণ্ডান যায় না, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা হইবেই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। যিনি যাহা প্রস্তুত করেন তাহা ভাঙ্গিয়া গড়িবার ক্ষমতাও রাখেন, ইহা যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তবে বিধিলিপি যখন আমি নিজেই গঠিত করিয়াছি তখন তাহা কেন আমি খণ্ডন করিতে পারিব না? আরও দেখুন কুকর্ম্মের দ্বারা যখন আমি গর্ম্মি বা গণোরিয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করিতে পারি, এবং জগৎপিতা তাহা হইতে শান্তি লাভের উপায় যখন ঔষধের দ্বারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন কি মনে হয় না যে আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কুকর্ম্মের কোন

* ভৃগুসংহিতায় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

না কোন শান্তি লাভের উপায়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। হাঁ নিশ্চয়ই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা খারাপ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ শান্তি রত্নাদির দ্বারা হইয়া থাকে। যাঁহারা নীলা (Sapphire) বা জহরতের গুণ অবগত আছেন তাঁহাদিগকে ঐবিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

সৌদামিনী যেমন অট্টালিকার উপরিস্থিত লৌহশলাকায় আকৃষ্ট হইয়া গৃহের অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ রত্নের দ্বারা গ্রহগণ আকৃষ্ট হইয়া মানুষের অশেষ অনিষ্ট দূর করিয়া তাহাকে ইহ সংসারে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, যশস্বী ও শোক, তাপ বিরহিত করিয়া সুখ শান্তি লাভ করাইয়া দেয়।

আরও শুনিয়াছেন কি? মুনিঋষিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে অগ্নি স্পর্শে তুলারাশি যেরূপ ভস্মীভূত হয়, গ্রহদোষও সেইরূপ রত্নের দ্বারা ভস্মীভূত হয়। রত্নের যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাহা প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিকই ইহা ধ্রুব সত্য এবং সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে নীলা বা লহশুনিয়া পাথর ধারণে ৭ দিনের মধ্যেই কাহারও বা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ এবং কাহারও বা ধনে প্রাণে নাশ হয়। যথার্থই দ্রব্যগুণের যে অসীম ক্ষমতা বর্ত্তমানে আছে তাহা ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। ইহা যদিও ধনীদিগের নিকট নূতন কিছু নয় তথাপি দরিদ্র ব্যক্তিরা ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে এখনও

অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। নীলা বহুপ্রকার কিন্তু প্রত্যেক নীলার ঐরূপ কার্য্যকারী ক্ষমতা নাই। কেহ যেন কাঞ্চন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিয়া প্রতারিত না হন এবং আমাদিগকেও প্রতারক মনে না করেন। মনে রাখিবেন নীলার ন্যায় প্রত্যেক রত্নেরই ঐরূপ অসীম ক্ষমতা আছে। অনেকে দশা হিসাবে রত্ন ব্যবহার করেন যথা—শনির দশায় নীলা, শুক্রের দশায় হীরা ইত্যাদি, আবার অনেকে নবরত্নও ধারণ করেন, সাহেবেরা মাসিক দশা হিসাবে রত্ন ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহা বড়ই ভ্রমাত্মক। নিম্ন লিখিত মন্ত্রের দ্বারাও গ্রহশান্তি হয়। ভক্তিভাবে প্রতিদিন ভোরে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে মাটী স্পর্শ না করিয়া প্রতিমন্ত্র ৪ বার করিয়া জপ করিতে হইবে অথবা স্নান করিয়া সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া পাঠ করিতে হইবে। (জলে দাঁড়াইয়া) শেষোক্তটি বিশেষ ফলদায়ক।

"বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ;
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ।"

ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ ঐঁ ক্লীং সোমায় নমঃ।
ওঁ হুঁ শ্রীঁ মঙ্গলায় নমঃ। ওঁ ঐঁ শ্রীঁ বুধায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শুক্রায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শনৈশ্চরায় নমঃ। ওঁ ঔঁ হ্রীঁ রাহবে নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ ঐঁ কেতবে নমঃ।

বর্ত্তমানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কারণ প্রায় প্রত্যেকের প্রাণেই একটু না একটু ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়াছে যে—ধর্ম্মের দ্বারাই জগত সুরক্ষিত আছে। ধর্ম্মই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। জগতে ধর্ম্ম হইতে অপর কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। ধর্ম্মই চিরস্থায়ী সমুদয় সুখের মূল। তাই শাস্ত্রেও উক্ত আছে—

"ধর্ম্মোহস্য মূলং ধনমস্য শাখা পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ ॥"

অর্থাৎ—ধর্ম্মই মূল, অর্থ ইহার শাখা, কাম (বাসনা) ইহার পুষ্প, এবং মোক্ষ ইহার ফল। অতএব পূর্ব্ব কথিত ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে অর্থ, বাসনা ও মোক্ষ লাভ হয়। ইংরাজীতেও আছে—"Seek ye first the kingdom of God and all other things shall be added unto you" (st Matthew) কিন্তু কলির এমনই মহিমা যে ধর্ম্ম করিতে গেলে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অধর্ম্মে তাহা হয় না। পরের দ্রব্যে লোভ করিও না, সদা সত্য কথা বলিও ইত্যাদি প্রায় সকলেই জানে, কিন্তু বর্ত্তমানে সত্য বলিলে রাজদ্রোহী হইতে হয়। চুরি করা মহাপাপ কিন্তু বাধ্য হইয়া তোমাকে পেটের দায়ে চুরী করিতে হইবে। মানুষের এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হইতে পারে? হায়! শিক্ষার কি এই পরিণাম? বর্ত্তমানে অধর্ম্ম যতই আশ্রয় করিবেন সুখ ততই বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু এই সুখ ক্ষণস্থায়ী কণ্ডুয়ন সুখের ন্যায়, তৎপরেই রক্তপাত ও জ্বালা। ব্রহ্মচর্য্যে চিরস্থায়ী

সুখ হয় জানিয়াও প্রার্থী হই না। সেইরূপ ধর্ম্ম হইতে চিরস্থায়ী সুখ হয় জানিয়াও প্রার্থী হই না। তাই বেদব্যাস বলিতেছেন—

"উর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥"

অর্থাৎ—আমি ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া বৃথা চীৎকার করিতেছি যে, ধর্ম্ম হইতে অর্থ এবং কাম উভয়ই উৎপন্ন হয় (অর্থের পর ধর্ম্ম হয় না পর পর হইবে) তবে লোকে উহার সেবা করে না কেন? কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিতেছে না।

জিজ্ঞাসু—কেন?

৩। ভক্তের ভগবান।

যদি জ্ঞানী হইতে না পারেন তবে ভক্ত হইয়া যান। কারণ সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তি-সাধন অতিশয় সহজ ও সুলভ। এ সাধনে বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-বিচার এ সকলের প্রয়োজন নাই। কেবল ভগবৎ সেবায় রত থাকিলেই সকল কাম হওয়া যায়। ভক্ত হইলে ভগবানের অনুগ্রহে জ্ঞান জন্মিবে।

জিজ্ঞাসু—ভক্ত না হইলে কি জ্ঞানী হওয়া যায় না?

বক্তা—কিছুতেই নহে। শুন শাস্ত্র কি বলেন—

"মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্র গর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি ॥"

অর্থাৎ—ঈশ্বরে ভক্তি যাহাদের নাই, তাহারা শাস্ত্র গর্ত্তে পড়িয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। ইহারা শাস্ত্র লইয়া থাকিলেও ইহাদের শত জন্মেও জ্ঞান হইবে না, মোক্ষও হইবে না।

"ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যতঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।"

অর্থাৎ—মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তির জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ।

"তথা শুদ্ধির্ন দুষ্টানাং দানাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধাত্মতা তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা ॥"

অর্থাৎ—দানে বল, অধ্যয়নে বল, দুষ্ট চিত্তের শুদ্ধি কিছুতেই তেমন হয় না, যেমন ভক্তিমানের শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবানের নাম ও যশ কীর্ত্তনে হয়।

"সংসারাময় তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে।"

অর্থাৎ—সংসার তাপে যাহারা তপ্ত হইতেছে ভক্তি মাত্রই সেই তাপ নিবারণের ঔষধ।

"মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥" (বিঃ চূ)

অর্থাৎ—মোক্ষের যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হইতেছে আপনার সচ্চিদানন্দ পূর্ণ স্বরূপের অনুসন্ধান। তাই শাস্ত্রেও আছে—

"যদা ভক্তি-রসো জাতো ন মুক্তীরোচতে তদা॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ—মানুষ ভক্তির রস পাইলে তাহার আর মুক্তিতে রুচি হয় না। রস নিজে রসাস্বাদ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু পরমহংসগণ রসাস্বাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞান হইতে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। অন্ধকার রাত্রে চক্ষু থাকিলেও দেখা যায় না। কিন্তু দীপের সাহায্যে সমস্তই দেখা যায়। সেইরূপ ঈশ্বরে ভক্তি রূপ প্রদীপ না থাকিলে আত্মার সম্যক্ প্রকাশ হইতে পারে না। এইরূপ কতই শাস্ত্র আছে—কত আর বলা যাইবে।

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে, তপোদান—ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ—তপস্যা, দান, প্রায়শ্চিত্তাদি করিলে পাপের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু হৃদয় লগ্ন পাপবীজ কিছুতেই হৃদয় হইতে যায় না; তজ্জন্য পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ হৃদয়-সংলগ্ন, পাপবীজ একমাত্র ভক্তি ব্যতীত বিনষ্ট হইবে না। শাস্ত্রে কথিত আছে, দেবতারাও মানবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পছন্দ করেন না—বিরুদ্ধাচরণ করেন। তবে যদি তুমি প্রথমে তাঁহাদের ভজন সাধন করিয়া প্রীত করিতে পার—তবে তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিবেন—এমন কি তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে সহায়তাও করিবেন।

যোগধর্ম্ম কিছু নয়, যদি নাহি ভক্তি রয়,
মুক্তিপথে ভক্তি দ্বার পাল।
যে জন তাঁহারে ডাকে, সে জন তাঁহারে রাখে,
হরির স্মরণে মুক্তি সর্ব্বকাল।

ভগবানে যদি প্রেম ভক্তি জন্মে তবে শীঘ্রই সব হয়, আর কোন কর্ত্তব্য বাকী থাকে না। বিশেষতঃ যতপ্রকার সাধনা আছে, ভক্তিই তাহার প্রাণ স্বরূপ। আমাকে একান্ত ভক্তগণ যাহা বলিয়াছেন—যে রূপে জ্ঞানই ভক্তির পরিণাম তাহা ধারণা করুন। লক্ষণ ভেদেই বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষণে প্রায় প্রভেদ নাই। বৈরাগ্য, বিচার, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দেবতাতে একান্ত প্রীতি—জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই এই এক লক্ষণ। গীতায় ভক্তি যোগে ভক্তের যে সব লক্ষণ বলা হইয়াছে জ্ঞানীতেও তাহা আছে। "তোমার

আমি” এই ভাবে ভক্ত ভজন করেন। “তুমিই আমি” ইহাই জ্ঞানীর ভজনা। এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও উভয়ের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ ফল একই। জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও কখন মুক্তি নাই। আবার ভক্তি ব্যতিরেকে যতই কেন উপায় কর না কিছুতেই জ্ঞান হইতে পারে না। অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি এই ক্রম সর্ব্ব সাধারণ। জ্ঞানীর জন্য মুক্তিই মুখ্য ফল, ভক্তি তাহার সাধনা। আর ভক্তের ভক্তিই মুখ্য এবং মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক। যোগিনী তন্ত্রে আছে—কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি, ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। হে মহাদেবি আমার এই কথা সত্য।

ভক্তির সাধনা অতি বিচিত্র, ভক্তি বিচার চাহে না, ভক্তি যুক্তি মানে না, ভক্তি নিষেধ শুনে না, ভক্তি অনুরাগময়ী, ভক্তি প্রেমময়ী—ভক্তি চতুর্ব্বর্গ চাহে না, ভক্তি আনন্দময়ী, ভগবানও ভক্তের নিকট আনন্দময়। ভক্ত স্বাধীন, সুতরাং ভক্তির সাধনায় কোন বিশেষ বিধি নাই। ভক্ত আপন মনে, আপন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, শাস্ত্র বিধিবদ্ধ উপচারের, শুচি অশুচির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অথবা দেশ, কাল, পাত্র বিচার না করিয়া, আপন ইষ্ট দেবতাকে আত্মনিবেদন উপচারে পূজা করে। ভক্ত সাকার নিরাকার বিচার করে না। ভক্ত সাম্প্রদায়িক দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করে না। ভগবানের একান্ত ভক্ত চিনি খেতে চায়, জ্ঞানীর মত চিনি হাতে চায় না। ভক্ত তবে কি চায়? ভক্ত চায় কেবল শ্রীহরির নাম করতে।

ভক্ত চায় নিজেকে ভগবানের কাছে নিজের দাস্য ও সখ্য ভাব জানাতে। মুক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের শীর্ষ স্থানীয় হইলেও ভক্তি হইতে নিকৃষ্ট। যিনি নির্গুণ ভক্তি যুক্ত তিনি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন ও তাঁহার দর্শন পান। ভক্তিবলে মানব সহজে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। শত অশ্বমেধ, সহস্র রাজসূয় যজ্ঞাদিতে যাহা না হইয়াছে, ধ্রুবের প্রেমভক্তির একটি ডাকে তাহাই হইয়াছে। পার্থিব জগতের প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি এইরূপ ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করা অতীব কঠিন। তবে কোন না কোন অংশে নির্ভরত্ব পাইয়াই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করিতেছে। যখন মানুষ ভক্তি প্রেম ঈশ্বরোদ্দেশে অর্পণ করে—তখন তাহা যদি প্রকৃত আধারে অর্পিত না হইয়া অপকৃষ্ট আধারেই অর্পিত হয়, তাহাতে ভক্তের অপরাধ হয় না। যথা—কোন বালক জন্মাবধি বিদেশস্থ পিতাকে দেখে নাই, কিন্তু পিতার অনুগ্রহ পত্রাদি, অর্থ সাহায্য আজীবন পাইয়া আসিতেছে। বালকের যখন ১৩ বৎসর বয়স, তখন তাহার বিদেশস্থ পিতা দেশে আসিলেন; পিতার সঙ্গে পিতৃব্য ও অন্য ২। ১ জন আত্মীয় আসিলেন। তখন ঐ বালক ভক্তিভরে 'পিতা' ভাবিয়া পিতৃব্য বা অন্য আত্মীয়কে প্রণাম করিল। এখন বলুন দেখি, ইহা দেখিয়া কি ঐ পিতা বালকের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন? কখনই না। তাহার পিতা বলিবেন, আহা! ও'র দোষ কি? ও'তো কখন আমাকে দেখেনি,—আমাকে ভাবিয়াই উহাকে প্রণাম করিয়াছে। যখন মানুষের

ব্যবহার এরূপ হয় তখন প্রেমের সাগর ঈশ্বর, কথনই অসন্তুষ্ট হন্ না। ভগবানই বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীতা ৪—১১)

জিজ্ঞাসু—ভক্ত কিরূপে হওয়া যাইবে?

বক্তা—সৎসঙ্গ না হইলে ভক্তি জন্মিবে না, অতএব আনন্দ বা প্রকৃত সুখ প্রার্থীর ভগবৎ সংসর্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। ভগবৎ সংসর্গ অর্থে—ভগবদ্ ভাবের অর্থাৎ ভগবদ্ ভাবাপন্ন ব্যক্তির সংসর্গ। এই অবলম্বন বা সংসর্গ যখন মানুষের হয় তখনই তাহার ধর্ম্মজীবন লাভ হয়। শাস্ত্রেও আছে—

"মদ্ভক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ।
মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্॥"

অর্থাৎ—আমার ভক্তের সঙ্গ কর—ভক্ত সঙ্গে নিরন্তর আমার সেবা কর। আবার শ্রীমুখে বলিয়াছেন— "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা" অর্থাৎ— আমার ভক্তের পূজা আমা হইতেও বড়। কেবলমাত্র প্রতিমা পূজা দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহাপুরুষগণই দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন আমি সকল ভূতেই আত্মরূপে অবস্থিত, যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে অথচ আমাকে প্রতিমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করে তাহার অর্চ্চনা বৃথা, সে কেবল মাত্র ভস্মে ঘৃত ঢালে। অনেকের ধারণা আছে যে জগৎ পিতার কৃপা ব্যতীত কিছু হয় না। এ কথাতে এমনি মনে হয় জগৎপিতা যেন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্ বিশেষ, তিনি আপনার খেয়াল মত কৃপা

করিয়া থাকেন, ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্ম, অপকর্ম্ম, যোগ্যতার কথা কিছুই বিচার করেন না। তাহার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যিনি "যমঃ সংযমতামহং।" অর্থাৎ—যিনি সাক্ষাৎ নিয়ম স্বরূপ, তাঁহার বিধানের মধ্যে কি অনিয়ম (Lawlessness) থাকিতে পারে। তিনি আপনার নিয়মকে কখন ভঙ্গ করেন না, এবং অন্য কেহ ভঙ্গ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার জোটিও নাই। দেবতারাও পান নাই। সাধারণতঃ লোকে বলে 'হাকিম লড়ে তবুও হুকুম লড়ে না'। এই কথাটি যথার্থই সত্য। জগৎ কর্ত্তা যদি এই নিয়মের শ্রদ্ধা না করিতেন তবে এই জগতের আজ কি দুর্দ্দশা হইত তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

তিনি যে পরম কৃপালু—ইহা তাঁহার জাগতিক নিয়মে বেশ বুঝা যায়। তাঁহার কৃপা সূর্য্যালোকের মত, সর্ব্বত্রে সমস্ত প্রাণীর উপরেই বর্ষিত হইতেছে, আমরাই সে কৃপা গ্রহণ করি না। যদি কেহ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, সূর্য্যালোক যেমন তাহার গৃহে স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না তদ্রূপ যে চিত্ত অসচ্চিন্তা ও অসৎ কার্য্যের দ্বারা আপনার চারিদিকে একটি দুর্ব্বাসনার প্রাচীর গ্রথিত করিয়াছে, সেও এই ভগবৎ করুণার কিরণ-লাভে আপনাকে আপনি অযোগ্য করিয়া তুলে। তাঁহার করুণা কিরণ তোমারি কুকর্ম্ম মেঘে আচ্ছাদিতবৎ প্রতিয়মান হইবে। ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

এ ভারতে যদি কিছু গৌরবের থাকে,
আছে তাহা ভক্তিযোগে জানে সর্ব্বলোকে।
ভক্তিমান্ সচ্চরিত্র যে জন হইবে,
পরানন্দ প্রার্থী তার পশ্চাৎ ধরিবে।

ভক্তে নাহি করি কোন জাতির বিচার,
যে জাতি হউন ভক্ত প্রণম্য সবার।
ভক্তের পরশে হবে আনন্দ উদয়,
ভক্ত পদ-ধূলিতে সকল পাপ ক্ষয়।
ভক্তের উচ্ছিস্ট করে যে জন ভোজন,
অবশ্য হইবে পাপে বিমুক্ত সে জন।
তাহার অঙ্গের ব্যাধি হইবে বিনাশ,
অন্তরে হইবে নিত্য প্রেমের বিকাশ।
ভক্ত প্রসন্নতা যেই লভিবে সেবায়,
তার তুল্য ভাগ্যবান্ নাহি এ ধরায়।
শিশু সঙ্গে পিতামহ খেলা যে প্রকার,
ভক্ত সনে ভগবান্ তথা অনিবার।
গোপীর সমান ভক্ত নাই ত্রিভুবনে,
সিদ্ধ ভিন্ন তাহা নাহি বোঝে সাধারণে।
ভক্ত আর ভগবানে যত ভাব হয়,
আনন্দ দায়িনী শক্তি সর্ব্ব মূলে রয়।
প্রকৃতির দর্প চূর্ণ ভক্তের নিকটে,
ভক্ত সনে ভগবানের নিত্য লীলা ঘটে।
স্বর্ণ যথা বহ্নিতাপে ম'লা ত্যাগ করি,
সমুজ্জ্বল হয় দেখ নিজ মূর্ত্তি ধরি,
আত্মা তথা ভক্তিযোগে ত্যজি কুবিষয়,
ঈশ্বরত্ব লাভ করি সমুজ্জ্বল হয়।
শ্রীকুমারের দুর্ভাগ্য ইহা না বুঝিল,
চিরকাল ভক্তিহীন মলিন রহিল।

৪। ইহ ও পরলোকে দাতার চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রণালী।

দান প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার গূঢ় রহস্য অনেকেই অবগত নহেন। তাই শাস্ত্রীয় বাক্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর দানের উপকারিতা এবং উদ্দেশ্য বিবৃত হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্র যে ধ্রুব সত্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আর শিক্ষিত সমাজে বিশেষ বলিয়া দিতে হইবে না। তবে মানব কৃত শাস্ত্রগুলি নহে; অমানব বা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের কথাই বলা হইতেছে। দান প্রথমতঃ তিন প্রকার। যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য; আর চতুর্থ বিমল নামক দান। এই দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নিত্যদান—সাধারণ ব্রাহ্মণকে, ফল উদ্দেশ না করিয়া, অহরহ যে কিছু দান করা হয় তাহা নিত্য দান।

নৈমিত্তিক—পাপ নাশার্থ পণ্ডিতদিগের হস্তে যে দান করা হয় তাহা নৈমিত্তিক দান।

কাম্য—সন্তান ঐশ্চর্য্য প্রভৃতির জন্য যে দান তাহাই কাম্য দান।

বিমল—ধর্ম্মযুক্ত চিত্তে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত যে দান করা হয় তাহাকে মঙ্গল জনক বিমল নামক দান বলে, এই দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"তপঃ পরং কৃতেযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে॥" (পরাশর)

অর্থাৎ—সত্যযুগে তপস্যা পরম ধর্ম্ম, ত্রেতায় জ্ঞান পরম ধর্ম্ম, দ্বাপরে যজ্ঞ পরম ধর্ম্ম এবং কলিকালে দানই একমাত্র ধর্ম্ম।

"তপোধর্ম্মঃ কৃতযুগে, জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্মৃতম্।
দ্বাপরে চাধ্বরাঃ প্রোক্তাঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ॥" (বৃহস্পতি)

অর্থাৎ—সত্যযুগের ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপরের ধর্ম্ম যজ্ঞ এবং কলিতে দান, দয়া ও দমই ধর্ম্ম। যম বলিতেছেন—

"যতীনান্তু শমোধর্ম্মস্ত্বনাহারো বনৌকসাম্।
দানমেব গৃহস্থানাং শুশ্রূষা ব্রহ্মচারিণাম্॥"

অর্থাৎ—শম যতিদিগের ধর্ম্ম, অনাহার বনবাসীর ধর্ম্ম, দান গৃহস্থের ধর্ম্ম, গুরুসেবা ব্রহ্মচারিদিগের ধর্ম্ম। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন—

"কলৌদানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধি করং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ—কলিযুগে দানই একমাত্র সমুদয় সিদ্ধির কারণ।

"ন সিধ্যতি কলৌ যোগো ন সিধ্যতি কলৌ তপঃ।
ন্যায়ার্জ্জিত ধনোৎসর্গৈঃ সদ্যঃ সিধ্যেৎ কলৌ পরম্॥" (কাশীখণ্ড)

অর্থাৎ—কলিকালে, যোগ বা তপস্যা সিদ্ধ হয় না, ন্যায়োপার্জ্জিত ধন প্রদানই কলিকালে সদ্য সিদ্ধি লাভের উপায়

"ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে।
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ শ্রীর্দানেনৈব লভ্যতে॥

দানেন প্রাপ্নুয়াৎ সৌখ্যং রূপং কান্তিং যশো বলম্।
দানেন জয়মাপ্নোতি মুক্তির্দানেন লভ্যতে॥
দানেন শত্রূন্ জয়তি ব্যাধির্দানেন নশ্যতি।
দানেন লভতে বিদ্যাং দানেন যুবতিং জনঃ॥
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্।
দানমেব ন চৈবান্যদিতি দেবো হব্রবীদ্রবিঃ॥
তস্মাদ্দানায় সৎপাত্রং বিচার্য্যৈব প্রযত্নতঃ।
দাতব্য মন্যথা সর্ব্বং ভস্মনীব হুতং ভবেৎ॥

অর্থাৎ—ত্রিভুবনে দানের অধিক আর কিছুই নাই। দান দ্বারা স্বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। দানদ্বারা সুখ, রূপ কান্তি, যশ এবং বল প্রাপ্তি হয়। দানদ্বারা জয় এবং মুক্তি লাভ হয়। দানদ্বারা শত্রুজয়, দানদ্বারা রোগনাশ, দানদ্বারা বিদ্যালাভ এবং দানদ্বারা তরুণী লাভ হয়। দানই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পরম সাধন, অন্য কিছু নহে। ইহা সূর্য্যদেব বলিয়াছেন। অতএব প্রযত্ন সহকারে সৎপাত্র নির্ণয় করিয়াই দান করা কর্ত্তব্য, নতুবা সমস্তই ভস্মে আহুতির ন্যায় হয়। দানের সৎপাত্র——বেদবেদান্ত—তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রৌতস্মার্ত্ত—ক্রিয়ানিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, বহুকুটুম্ব—সম্পন্ন, তপস্বী, তীর্থ-নিরত, কৃতজ্ঞ, মিতভাষী, গুরু-শুশ্রূষারত, স্বাধ্যায় শীল, শিবপূজারত, ভূতিশাসন ভূষিত, বৈষ্ণব বা সূর্য্যভক্ত দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ সৎপাত্র। দানফলে অভিলাষ থাকে ত ইঁহাদিগকেই দান করিবে। বলা বাহুল্য, কাণা, খোঁড়া, বধির ইত্যাদি দানের পাত্র নয়, তাহারা দয়ার পাত্র।

"দানানামুত্তমং দানং বিদ্যাদানং বিদুর্বুধাঃ।"

পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন সর্ব্ব দান অপেক্ষা বিদ্যাদান উত্তম। কিন্তু——

"অন্নদানং প্রশংসন্তি বিদুষো বেদবাদিনঃ।
অন্নমেব যতঃ প্রাণাঃ প্রাণদানসমং হি তৎ॥"

অর্থাৎ—বেদবাদিগণ অন্নদানের প্রশংসা করেন, অন্নই প্রাণ কিনা, তাই অন্নদান এবং প্রাণদান সমান।

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—জ্ঞান দানের অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, দান, ব্রত, জপ, তপ, উপবাস, তীর্থসেবা উহার ষোল ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। একারণ জ্ঞানদাতা মাতা পিতা হইতেও অধিক পূজনীয়।

"দরিদ্রস্যাল্পদানেন ধনিনো ভূরি বৈ সমম্।"

অর্থাৎ—দরিদ্রের অল্পদান এবং ধনীর প্রচুর দান উভয়ইসমান।

"দানধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে"

অর্থাৎ—দানধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ধন প্রাণীদিগের আর কিছুই নাই। ধর্ম্মের নানা পন্থা ও লক্ষণ শাস্ত্রে ব্যক্ত থাকিলেও কলিযুগে দানধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং স্বর্গ ও মোক্ষের নিদান তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্মোপরি।
(ওমা!) বিনাদানে মথুরাপারে যাননি ব্রজেশ্বরী॥

"ন তপাংসি ন শাস্ত্রাণি ন তীর্থানি জয়ন্তি বঃ।
সংসারসাগরোত্তারে বিনা সজ্জনসেবনং॥"

অর্থাৎ—সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে তপস্যা, শাস্ত্র এবং তীর্থের দ্বারা কিছু হয় না, কেবল সজ্জনদের পুনঃ পুনঃ সেবা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

"পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জাল মিদমেব সুনিশ্চিতম্।
নোপকারাৎ পরং পুণ্যং নাপকারাদঘং পরম্॥"

অর্থাৎ—সমস্ত শাস্ত্ররাশি মন্থন করিয়া ইহা নিশ্চিত রূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উপকার হইতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য নাই, এবং অপকার হইতে ঘোরতর পাপ নাই। পরোপকার ধর্ম্ম এবং দানাদিসম্ভূত যাবতীয় ধর্ম্মকে বিধাতা এক তুলাদণ্ডে ওজন করিয়াছিলেন, তাহাতে পরোপকার ধর্ম্মের দিক ভারী হইয়াছিল।

ভালমন্দ যে যা করে, কালক্রমে তার,
স্বভাবে সে পায় পুরস্কার তিরস্কার।
ত্যাগের অপূর্ব্ব প্রতিদান হাতে হাতে,
যে করেছে ত্যাগ, * সেই জানে ভাল মতে।
আপন সর্ব্বস্ব পরহিতে যে বিলায়,
জগতের সর্ব্বস্ব সে হাতে হাতে পায়।
মানুষ হইয়া যদি অমরত্ব চাও,
পরহিত-ব্রত করি আত্ম-বলি দাও।

---

* সি, আর, দাস আপনার সর্ব্বস্ব পরহিতে বিলাইয়াছিলেন বলে, মৃত্যুর পর এরূপ ডেথ্‌প্রসেসন হইয়াছিল যে ভারতে কেন, বিলাত, জার্ম্মাণ বা ফ্রান্সের কোন বাদ্‌শাহারও ঐরূপ—ডেথ্‌প্রসেসন্ হয় নাই এবং মৃত্যুর পর বহুলক্ষ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছিল।

কারণ আবিষ্কার করুন না কেন; একদিন আধ্যাত্মিক জগতের এ সূক্ষ্ম শক্তিই যে অভাবের মূল কারণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ স্থূল হইতে যে সূক্ষ্মের শক্তি অধিক তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্রে কলিতে দানের এত প্রশংসা কেন?

বক্তা—কারণ দানধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা অত্যন্ত সহজ এবং অনায়াসসাধ্য। যেহেতু যজ্ঞধর্ম্ম এবং তপোধর্ম্ম ইত্যাদি সাধন করিতে অর্থাদি ব্যতীত সবিশেষ শারীরিক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে ক্রিয়াবান্ লোক কমই পাওয়া যায়। আর শাস্ত্রেও আছে—যে স্থানে নারীজাতি দুঃখে কাল যাপন করে, সে স্থানে কোন পবিত্র অনুষ্ঠানই সুফল প্রদান করে না; তাহা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল। বলা বাহুল্য স্মরণাতীত কাল হইতে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সভ্যজাতি এবং মুনি ঋষিরা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে অন্যান্য সৎকর্ম্ম গুলির অনুষ্ঠান করা বর্ত্তমানে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু দানধর্ম্ম কেবল আপন বস্তু অপরকে প্রদান করিলেই সম্পন্ন হয়। অতএব এই ধর্ম্ম অতীব সুখসাধ্য। আপন বস্তু সম্বন্ধচ্যুত করিয়া অপরকে প্রদানের নাম দান। যে দাতা দত্ত বস্তু হইতে চিত্তকে যত অধিক সম্বন্ধশূন্য করিতে পারেন তাঁহার দান তত উত্তম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা এবং নীচতার বশবর্ত্তী হইয়া

যাহারা দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে তাহাদিগকে পরলোকে নরক যন্ত্রণা উপভোগ এবং জন্মান্তরে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। (Actionএর Reaction) অতএব কৃপণকে নরক ও দরিদ্রতা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, ইহাই বিজ্ঞান মীমাংসাদর্শনসিদ্ধ। কোন মনুষ্য যদি স্বীয় আয়ত্তীভূত পদার্থের অপব্যবহার করে তাহা হইলে কর্ম্মমীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম্মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়মানুসারে জন্মান্তরে তাহাকে সেই পদার্থের অভাব ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ধনবান্ ব্যক্তি যদি ধনের অপব্যবহার করে তবে তাহাকেও জন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল যে, কৃপণ এবং ধনের অপব্যবহাকারী উভয়কেই পরলোকে নবক এবং জন্মান্তরে দরিদ্রতা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য আয়ের সিকি ভাগ দান করার ব্যবস্থা আছে। ॥০ আনা দ্বারা নিজ ও পরিবারবর্গ পোষণ। ।০ আনা মূলধনস্বরূপ আপদকালের জন্য। ।০ আনা দান। এই প্রকার আচরণ করিলে অর্থের সফলতা সাধিত হয়। বাস্তবিক উপার্জ্জিত অর্থের চতুর্থাংশ পরের উদরে রাখিলে তাহা ব্যাঙ্ক ও লৌহ সিন্দুক হইতে যে নিরাপদ এবং শত শতগুণ বৃদ্ধিকারক ও অভাবের পূরণকারক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরাজীতে ও আছে—

"Who shuts his hand lost his gold,
Who opens it hath it twice told." (Herbert)

জিজ্ঞাসু—ধন দান করিলেই কি দাতা হওয়া যায়?

বক্তা—না। তাহা কখনই হইতে পারে না। যেমন রণজয়ী হইলে বলবান হয় না, অধ্যয়ন করিলে ও পণ্ডিত হয় না; বহুতর কথা কহিতে পারিলেও বক্তা হয় না, কেবল অর্থ দান করিলেও দাতা হয় না। তবে কি প্রকারে হয়? ইন্দ্রিয় গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে সেই পণ্ডিত হয়, এবং যে ব্যক্তি হিত এবং প্রিয়বাক্য বলে সে ব্যক্তিই বক্তা হয়, এবং যে ব্যক্তি সম্মান পূর্ব্বক দান করে সে ব্যক্তিই দাতা হয়। নিম্ন ঘটনায় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন।

ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাইয়ের নাম ও পুণ্যকীর্ত্তি অনেকেই শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন। কথিত আছে—অহল্যাবাই প্রচুর ধনের অধিকারিণী ও যথেষ্ট দান করেন, এই সংবাদে মহারাষ্ট্রীয় পেসোয়া (যিনি সে সময়ের প্রায় সম্রাট্ তুল্য ছিলেন,) তাঁহার সমুদয় ধনরত্ন কাড়িয়া লইবার জন্য দস্যুর দল পাঠাইয়া ছিলেন। যখন দস্যুরা তাঁহার রাজ ভবন আক্রমণ করে তখন তিনি পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। অহল্যা বাইয়ের নিকট দস্যুগণের আগমন বার্ত্তা পৌঁছিলে তিনি পূজার স্থান ত্যাগ না করিয়া, প্রধান দস্যুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রধান দস্যু বলিল, পেসোয়ার হুকুম অনুসারে আমরা আপনার সমুদয় ধনরত্ন কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি।

অহল্যাবাই—যদি পেসোয়া আমার সমুদয় সম্পত্তি লইতে ইচ্ছা করেন, লউন, আমি স্বইচ্ছায় খুসীর সহিত দিতেছি। তোমাদের কষ্ট করিয়া কাড়িয়া লইতে হইবে না। এই বলিয়া সমস্ত ধনরত্ন একত্র করাইয়া, প্রগাঢ় ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। তৎপরে দস্যুকে ঐ সমস্ত লইয়া যাইতে বলিলেন। প্রধান দস্যু রাণীর এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া ধন সম্পত্তি গ্রহণ না করিয়া এই সংবাদ পেসোয়াকে জানাইল। পেসোয়া অহল্যাবাইয়ের এই ব্যবহারের কথা শুনিয়া, এত সন্তুষ্ট হইলেন, যে তিনি কোন ধনই গ্রহণ করিলেন না, অধিক কি রাণী অহল্যার যত অর্থ ছিল, তাহার চারিগুণ তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। অহল্যা যে ধন কৃষ্ণার্পণ করিয়াছেন, তাহা নিজে ফিরাইয়া লইতে অস্বীকৃত। অবশেষে পেসোয়ার অনুরোধে কৃষ্ণার্পিত ধন ও পেসোয়ার দেওয়া অর্থ, নিজ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু তাহা নিজের ব্যবহারে না আনিয়া ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রকৃত ভক্তির সহিত ধন অর্পণ করিলে তাহা নিশ্চয়ই ঐ রূপ চারিগুণ বা ততোধিক হইয়া ফিরিয়া আসে।

জিজ্ঞাসু— শাস্ত্র সৎপাত্রে দানের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, অপাত্রে দানের তেমনই নিন্দা করিয়াছেন। অপাত্রকে দান করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নরকে গতি হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎপাত্র বুঝিব কি করিয়া? আর বুঝিলেই বা এইকালে তাদৃশ পাত্র পাইব কোথায়।

বক্তা—শাস্ত্রে সৎপাত্রের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট সৎপাত্র ভাগ্যবানেরই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাবৎ তুমি সৎপাত্রের দর্শন লাভ না করিতেছ, যাবৎ তোমার পাত্রাপাত্র বিচার করিবার ক্ষমতা না জন্মিতেছে, তাবৎ তোমাকে পাত্র নির্ব্বিশেষে দান করিতেই হইবে। কারণ গৃহস্থের দ্বারে সৎ ও অসৎ উভয়ই উপস্থিত হয়। অপাত্রকে অপাত্র জানিয়া দান করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তুমি যদি কখন অপাত্রকে পাত্র জ্ঞানে দান কর, তাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, তজ্জন্য তোমাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না; কারণ তুমি ত পাত্র জ্ঞানেই তাহার সৎকার করিতেছ। ভগবান্ ত মানুষের মত অল্পদর্শী নহেন, তাঁহার নয়ন ত দেশ কাল বাধ্য নহে। এই প্রকারে দান্ করিয়া যাইলে সেই পুণ্যবলে একদিন ভগবান্ প্রকৃত পাত্র প্রেরণ করিবেন, অথবা স্বয়ংই তদ্রূপ ধারণ করিয়া তোমার নয়ন পথ গামী হইবেন, যিনি দাতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। (মনুসংহিতা)

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্রে অপাত্রে দানের এত নিন্দা করিয়াছেন কেন? এবং দাতাই বা নরকগামী কি করিয়া হয়?

বক্তা—মনে কর, তুমি স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত, দুরাচার, পরপীড়া-নিরত, নিজ ও পরকীয় কোনরূপ কল্যাণ সাধনে অসমর্থ, কোন পুরুষকে তাদৃশ স্বভাব সম্পন্ন জানিয়াও দান করিলে, ইহার

ফল কি হইবে? সে ইহা মদ্যসেবা ও পর-পীড়াদিতেই প্রয়োগ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমার এই দান দ্বারা তাহার এবং অপরের অনিষ্ট হইল। অপাত্রকে অপাত্র জানিয়া যে দান করে তাহার মত মূর্খ এবং পাপী এ জগতে আর কে হইতে পারে? তবে ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে যে অপাত্র হইলেও ক্ষুধার্ত্ত বা শীতার্ত্তকে একমুটা অন্ন দিবে না।

জিজ্ঞাসু—যাহারা দান গ্রহণ করে তাহারা কি পুণ্য অর্জ্জন করে?

বক্তা—যাহারা দান গ্রহণ করে তাহারা আজীবন পাপই অর্জ্জন করিয়া থাকে, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এখনও বহু তীর্থস্থানে অনেক আছেন, যাঁহারা অতি দীন ভাবে থাকিয়াও দান গ্রহণ করেন না। অনেকে শুনিয়াছেন যে—নাটোরের ৺রাণীভবানী কাশীধামে যে কয়েক বৎসর ছিলেন, সেই কয়েক বৎসর প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূজা পাঠ সমাপন করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে একখানা প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা দান করিতেন। বর্ত্তমানে উক্ত অট্টালিকাগুলি মহারাষ্ট্রী, তেলুঙ্গী ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণ ভোগদখল করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তখন উহা গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে অনাহারে থাকাও শ্রেয় তথাপি দান গ্রহণ করা অন্যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ অশিক্ষিতেরাই দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারা

যদি দান গ্রহণ না করেন তবে জগতের সবলোকই প্রাকৃতিক নিয়মে সমান হইয়া যায়, ধনী দরিদ্রে আর প্রভেদ থাকে না। তখন ধনীদের নিকট আবেদনের ঝুলি লইয়া খোসামোদ করিতে হইবে না, এবং নানারূপ অন্যায় আত্যাচারও সহ্য করিতে হইবে না।

জিজ্ঞাসু—দানের ফল কি ইহকালেই পাওয়া যায়?

বক্তা—হাঁ! চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তে দানের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া শাস্ত্রও বলিতেছেন—

"ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ—অত্যন্ত উৎকট যে পাপ ও পুণ্য তদ্বারা ইহলোকেতেই তিন দিনেতে বা তিন পক্ষেতে বা তিন মাসেতে কিম্বা তিন বৎসরেতে ফলভোগ হয়। শাস্ত্রে ইহাও আছে যে—সকাম দানের ফল ইহকালে এবং নিষ্কাম দানের ফল পরকালে ভোগ হয়। বলা বাহুল্য এজন্যই হাতের রেখাগুলি মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

বলেন মাধব দাস গৃহস্থ যে জন;
কোন ব্রত সর্ব্ব অগ্রে করিবে গ্রহণ?
উত্তরে সন্তান, "ভবে গৃহস্থ আশ্রম,
সেবাধর্ম্ম জন্য হয় সর্ব্বত্র উত্তম।
অনায়াসে সিদ্ধিলাভ সেবায় মিলায়,
সেবার মতন নাই তপস্যা ধরায়।

তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম অতিথি-সেবন, *
অভ্যাগত অতিথি প্রত্যক্ষ নারায়ণ।
অতিথি সেবিয়া দাতাকর্ণ মহাজন,
গৃহে বসি নারায়ণে করিল দর্শন।
দ্রোণ দ্রোণী একমনে অতিথি অর্চ্চিল,
তাই নন্দ যশোমতী হ'য়ে জনমিল।
মহারাজা রন্তীদেব অতিথি সেবিয়া,
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি গিয়াছে রাখিয়া।
ক্ষণস্থায়ী হয় এ নর-জীবন এ ভূতলে,
চিরস্থায়ী হয় ইহা পরসেবা বলে।
পরের সেবায় হয় উত্তোগী যাহারা,
পরাৎপর দয়া প্রাপ্ত নিত্য হয় তারা।
তুচ্ছ অর্থনীতি লোকে পড়িয়া এখন,
দানধর্ম্ম মানুষে দিতেছে বিসর্জ্জন।
কৃপণতা দোষে দেশ বিনষ্ট-স্বভাব,
তাই জাতি হীনবীর্য্য, বিগত-প্রভাব।
তপস্যা বিহীন দেশ দৈব কৃপা নাই,
নিত্য নব যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত তাই।
আবার আসুক দেশে পিতৃমাতৃ-ভক্তি,
,, ,, ,, জীবসেবা শক্তি,
,, হউক দেশ মোহপাশে মুক্তি,
আপনি জাগিবে দেশে মহীয়সী শক্তি।
আপন কর্ত্তব্যে নাই দৃঢ়তা উত্তোগ,
মুখে লম্ফ ঝম্ফ শ্রীকুমারে কর্ম্মভোগ।

* অতিথি লাভের জন্য শ্রাদ্ধশেষে হিন্দুগৃহী পূর্ব্বপুরুষ দিগের নিকট প্রার্থনা করেন "অতিথিঞ্চ লভেমহি" অতিথি যেন পাই।

৫। ইহ ও পরলোকে ভগবানকে লাভ করিবার প্রণালী।

আমরা ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। যদিও শাস্ত্রে নানা রূপ উপায় আছে তন্মধ্যে ভগবানের নাম গান সাধন করা বড়ই সহজ ও সুখসাধ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"জপাৎ কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণোলয়ঃ।
লয়াৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

অর্থাৎ—এক কোটিবার জপ করিলে যে ফল হয়, একবার ধ্যান করিলে সেই ফল হয়। এবং এক কোটিবার ধ্যান করিয়া যে ফল হয়, একবার লয় হইলে সেই ফল হয়। এবং এক কোটিবার লয় করিয়া যে ফল হয়, একবার ভগবানের নাম গান করিলে সেই ফল হয়। তবেই দেখা যায়—জপ, তপ হইতে গান কোটি কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিয়াছেন, প্রকৃতির নিয়মে ও আমাদের কর্ম্মদোষে কলিযুগে ধর্ম্ম—একপাদ মাত্র। সুতরাং জপ, তপে বিশেষ ফল হইবার আশা নাই; যদিই বা হয় তাহা বহু কষ্ট সাপেক্ষ, এ হেন অবস্থায় মুক্তির একটি সহজ উপায় আছে যাহার দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়; সেটি—হরিনাম গান। মহিষ মর্দ্দিনী তন্ত্রে লিখিত আছে যে এই কলিকালে বহু লোকই অতি পাষণ্ড এবং

যাহারা পাষণ্ড নহে তাহারাও পাষণ্ডের সংসর্গে দূষিত, সে হেতু জপ, তপ ও পূজাদিতে কোন ফল হইবে না, বিশেষতঃ অনেক দেবতারা মন্ত্রেও শাঁপ দিয়াছেন। দেবতার শাঁপে কি না হইতে পারে?—কাশীধামে গঙ্গায় জোয়ার ভাটা হয় না, টিক্‌টিকির শব্দ হয় না, তরীতরকারীর স্বাদ পাওয়া যায় না, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না। ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এতাদৃশ ভারতবর্ষে মুক্তির একটি সহজ উপায় আছে, সেটি—নামগান। গান বাজনার মধ্যে এরূপ এক মহাশক্তি নিহিত আছে—যাহার প্রভাবে দেবদেবী, নর নারী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ এমন কি বিষধর সর্প পর্য্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, এবং ইহার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। যথা—আপনি যতই দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকুন, একবার মাত্র ভগবানের নামগান করিলে বা শুনিলে তাহা আগুণে জল ঢালার ন্যায় শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। ভাবের গান হওয়া চাই। গান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে নব রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন চিকিৎসক ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানসিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই সঙ্গীত প্রভাবে আরোগ্য হইতে পারে। প্রাচীন ওস্তাদগণ বলিয়া গিয়াছেন ভৈরব রাগে বিনা বলদে কলুর ঘানি ঘুর্ণন, সংক্রামক জ্বর, মস্তিষ্কের পীড়া ইত্যাদি আরোগ্য হয়। স্বর শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না এমন ক্রিয়াই নাই। প্রবাদ আছে জনৈক

স্ত্রীলোক বেহাগ রাগিনীর সুরে মুগ্ধ হইয়া মৎস্য কুটিতে কুটিতে আপন ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তানকে কুটিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্য দিবাভাগে বেহাগ রাগ নিষিদ্ধ। মার্কিণ দেশীয় একজন বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং তাহা কুইন্সল্যাণ্ডার (Queenslander) নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যে তিনি বাদ্য যন্ত্রের স্বরের দ্বারা ৬।৭ তল বৃহৎ অট্টালিকাকেও ভূমিসাৎ করিতে সক্ষম। কিন্তু আরও যদি ইহার অন্তর্নিহিত বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তবে এ জগতে যাহা চাহিবেন গানের দ্বারা তাহাই পাইবেন। মহাত্মা রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, তানসেন, তুলসীদাস, মীরাবাই, নানক ইঁহারা সঙ্গীত দ্বারা পরম পদ ও মোক্ষ লাভ করিয়া গিয়াছেন বলা বাহুল্য সত্বগুণের মানব ব্যতীত সাধারণে জপ তপের দ্বারা এরূপ ফল হাতে হাতে পাইবেন না। কারণ গানে যেরূপ মনের একাগ্রতা ও ভক্তি হয় তত সহজে অন্য কিছুতেই হয় না। হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান পবিত্র গ্রন্থ বেদের উৎকৃষ্ট ভাগই কতক গুলি হৃদয়ের ও প্রাণের আবেগময় গান বতীত অন্য কিছুই নহে। সঙ্গীতের দ্বারা ভাবে বিভোর হইয়া দেবতাদিগের পূজা, স্তবস্তুতি, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও ধর্ম্ম উপদেশ ইত্যাদি দেখান হইযাছে, এমন সরল ভাবময় ও প্রাণের আবেগময় গান বেদ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে নাই, এবং ইহাই সঙ্গীত বিদ্যার আদি বা মূল গ্রন্থ। যাঁহারা বেদ পাঠ শুনিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা নূতন নয়। মহাদেবের পঞ্চ মুখ হইতে ৫টি সুর

এবং পার্ব্বতীর মুখ হইতে ষষ্ঠ স্থর দ্বারা ৬টি রাগ সর্ব্বপ্রথম গীত হইয়াছিল। কোন একটি কারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে মহাদেব সঙ্গীত স্থষ্টি করিতেন না। আর্য্যগণ সত্যযুগে এই স্থর দ্বারা এক এক ঋতুতে গান গাহিয়া ভগবানের নিকট যাহা চাহিতেন তাহাই পাইতেন। যথা—বৃষ্টির জন্য মেঘমল্লার, রৌদ্রের জন্য দীপক ইত্যাদি।

হে নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী! শাস্ত্রে আছে যে, যে ভাবের উপাসক হউন না কেন তাঁহারা গান দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। যে উপনিষৎ নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতেই উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে।

(ক) ব্রহ্মবাদীরা সামগান দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে।

(খ) হোতাব্যক্তি প্রণব গানদ্বারা সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম সাধন করিলেই সেই কর্ম্মের ফলভাগী হয়।

(গ) যাহারা ফলভোগে অভিলাষী হইয়া পরব্রহ্মের আরাধনা করে তাহারা উদ্গাতা অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিয়া থাকে।

(ঘ) যিনি গান কর্ত্তাকে ত্রাণ করেন তিনিই গায়ত্রী। এই গায়ত্রীই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রশস্ত উপায়। স্বয়ং ভগবান্ কি বলিতেছেন শুনুন—

"নানাবিধৈর্মহাবাদ্যৈর্নৃত্যৈশ্চ বিবিধৈরপি।
নানাবেশবরৈর্নৃত্যৈঃ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ॥

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তোষণীয়ো মহেশ্বর ॥"

অর্থাৎ—নানাবিধ বাদ্য, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী ও বহুবিধ নৃত্যে ভগবান শঙ্কর (মহাদেব) প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবান প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কিছুই থাকে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহার তুষ্টি বিধান করা কর্ত্তব্য। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকোমহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈবসর্ব্বঃ স্বার্থোহপি লভ্যতে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অর্থাৎ—কলির সমস্ত দোষ থাকিলেও ইহার একটি বিশেষ গুণ আছে। ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সাধন করিতে পার আর না পার, হরিনাম করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। বন্ধন মোচন ও পরমপদ লাভ হইবে। এই কলিকালে হরিনাম বিনা জীবের আর অন্য গতি নাই ইত্যাদি বচন যে ধ্রুব সত্য তাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা হাতে হাতে পাইয়াও নিরস্ত হইতেছি, যে মহামন্ত্র বলে সিদ্ধি লাভ, যোগসাধন, ভজন-পূজন, মিত্র-তোষণ, শত্রু-দলন, রাজপ্রসাদ লাভ, আত্মতুষ্টি, রোগারোগ্য, আর সর্ব্বোপরি ভগবৎ কৃপালাভ হয়, দুঃখের বিষয় সেই

কলা বিদ্যাকে আমরা অবহেলা করিতেছি। ইহা আজ ভারতবাসীর নিকট অধিকাংশ স্থলে প্রেম ও লজ্জার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক জ্ঞানহীন মানব আর কর্ণধারহীন তরণীর একই অবস্থা। এ সব আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ও শাস্ত্রীয় বিধি সম্মত ঋষি বাক্য।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা করিয়া যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায়, কলিকালে কেবল হরিসঙ্কীর্ত্তন করিলেই তাহা লাভ হয়। অতএব আমরা চাই ভারতের ৩৩ কোটি দেবতার মধ্যে যাহার যেরূপ রুচি সেই মত দেবতা আশ্রয় করিয়া কেবল তাঁহারই আগমনী গানে প্রত্যহ আরাধনা করেন বা শুনেন; বলা বাহুল্য আগমনী গান ব্যতীত বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে এই প্রকার সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হউক, যাহাতে সকলেরই নাম গানে মতিগতি হয়। উক্ত উপদেশ মত কার্য্য করিয়া যদি কেহ বিশেষ ফল না পান, তজ্জন্য আশ্রম দায়ী থাকিবেন এবং ইহজগতে যদি কেহ প্রত্যেকের সুখ শান্তির অধিকতর প্রত্যক্ষ ও সহজ উপায় দেখাইয়া দিতে পারেন তবে তিনি আশ্রমের পরম গুরু হইবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৬। প্রশ্নোত্তর।

প্রঃ— সর্ব্বাপেক্ষা দীন হীন কে অবনী তলে ?
উঃ— পর মুখাপেক্ষী হয়ে যেই জন চলে।
প্রঃ— কে দিয়াছে আপন সম্মান বিসর্জ্জন ?
উঃ— পরদ্বারে প্রার্থি–ভাবে উপস্থিত জন।
প্রঃ— নীচাশয় অভদ্র পাষণ্ড কোন জন ?
উঃ — ধর্ম্মপ্রান সাধুকে করে যেই পীড়ন ?
প্রঃ— পরহিত দর্শনে অন্তর জ্বলে কার ?
উঃ— পরশ্রী কাতর সেই অতি দুর্ভাগার।
প্রঃ— কোন্ প্রাণী দেহে আছে দুই মলদ্বার ?
উঃ— এক মুখে দুই কথা অভ্যাস যাহার।
প্রঃ— ধন জনাবৃত হয়ে দুঃখী কোন্ জন ?
উঃ— অবিশ্বাস সন্দেহে চঞ্চল যার মন।
প্রঃ — কোন্ জন্তু এ ভুবনে অতি ভয়ঙ্কর ?
উঃ— মূর্খ আর কলঙ্কের শঙ্কা হীন নর।
প্রঃ— কোন্ বিষ আস্বাদনে অমৃত সমান ?
উঃ— কামিনী, যাহার সঙ্গে যায় ধর্ম্মজ্ঞান।
প্রঃ— কোন্ স্নেহময় পিতা শত্রু সম হয় ?
উঃ— সন্তান সুশিক্ষা তরে উদ্যোগী যে নয়।
প্রঃ— কর্ম্মের বাহির কা'রা অপদার্থ অতি ?
উঃ— যাহাদের লক্ষ্য সদা আমোদের প্রতি।
প্রঃ— সাধু ধনী হিতৈষীর শত্রু কোন্ জন ?
উঃ— দুর্ম্মতি দুরাশ আর অকর্ম্মা অক্ষম।
প্রঃ— কোন্ ব্যক্তি ভাগ্যবান্ কহ শ্রীকুমারে ?
উঃ— আমরণ সচ্চরিত্র যে জন সংসারে।

———:*:———

৭। উপদেশ।

১। ধর্ম্ম পথ সরল নহে কিন্তু পাপের পথ বড়ই সরল।

২। মন্দ পথে চালাইবার ব্যক্তির অন্ত নাই, কিন্তু সুপথের সহায়াত্রী অতি অল্প।

৩। কু সংবাদ বড়ই দ্রুতগামী।

৪। অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান বৃদ্ধ বয়সে বিষাদ দান করে।

৫। পরকালের চিন্তা যার নাই সে আবার মানুষ কিসের।

৬। সংসার অস্থায়ী পরকাল চিরস্থায়ী।

৭। চক্ষু মুদিলে ধন জন পড়িয়া রহিবে, কেবল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঙ্গের সাথী হইবে।

৮। জলের তরঙ্গে নৌকা ডুবে, ধনের তরঙ্গে পরকাল ডুবে।

৯। ভগবান্ ধন দিয়ে মন বুঝেন, যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝেন।

১০। ক্ষমার চেয়ে বড় গুণ নাই, দানের চেয়ে বড় পুণ্য নাই।

১১। যদি দান করিয়া পুণ্যের অধিকারী হইতে চাও তবে গুপ্তভাবে দান করিও।

১২। বাক্যের সার যেমন সত্য, অর্থের সার তেমনই দান।

১৩। যত উপার্জ্জন ততই অভাব।

১৪। গুণ যার আছে পেটে সেকি কভু চটে উঠে।

১৫। জ্ঞান ভিন্ন নম্রতা জন্মে না।

১৬। মানুষের প্রকৃত রূপ ফুটে বেরোয়, যখন তার স্বার্থে এসে আঘাত লাগে।

১৭। যদি তুমি পুত্রধনে সুখী হইতে চাও, তাহা হইলে নীতি ধর্ম্ম ও জাতিবিদ্যা তাহাকে শিখাইও।

১৮। নিজের আত্মীয়কে টাকা ধার দিয়ে, তা ফিরে পাবার প্রত্যাশা ক'রো না।

১৯। না শিখিয়া ওস্তাদি করিতে যাইও না।

২০। ধনবান্ পরাধীন অপেক্ষা দরিদ্র স্বাধীন উত্তম।

২১। পরাধীন জাতির উন্নতির প্রধান সোপান ধর্ম্ম ও একতা।

২২। পীড়া অসাবধানতার শাস্তি।

২৩। যার হয় যত শুক্র ক্ষয়, তারই তত রোগের ভয়।

২৪। রিপুর বেগ যে সহ্য করে কোন্ ব্যাটা তার আয়ু হরে।

২৫। প্রফুল্লতা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ হজ্‌মি গুলি।

২৬। নিজের উদ্দেশ্য সফল না হইতে গালগল্পে মাতিওনা।

২৭। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গিন্নির পাপে গৃহ নষ্ট।

২৮। ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী।

২৯। ক্রোধে হাস্য, অল্পে তুষ্ট, দুঃখে সান্ত্বনা দান, সৎস্বভাবী স্ত্রীলোকের এই তিন লক্ষণ।

৩০। সামান্য বিষয়ে ক্রোধ, দুঃখে অধীর, সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব, কুস্বভাবী স্ত্রীলোকের এই তিন লক্ষণ।

৩১। প্রহার অপেক্ষা উপদেশ সমধিক কার্য্যকর।

৩২। কি করিবে বক্তা, যদি শ্রোতা নাহি থাকে;
উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেশে কি করে রজকে।

দীর্ঘজীবন লাভের উপকরণ।

ষড়রিপুর দমন, নির্ম্মল চরিত্র, সদানন্দতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৎসঙ্গ, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ, নিরামিষ আহার। অল্প গরম খাদ্য, দৈনিক পরিশ্রম শীলতা, উপযুক্ত বিশ্রাম। আহার বিহারে মিতাচার, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, উত্তম রূপে আহার্য্য চর্ব্বণ, আলোক এবং বায়ু সঞ্চালিত শয়ন কক্ষ, সুনিদ্রা, প্রাতঃস্নান, আহারের পরে সদ্য দধি ভক্ষণ, ধর্ম্মের দশবিধ লক্ষণ প্রতিপালন।

———:❋:———

ভ্রান্তি।

পুরাতন ভারতের ঋষি একদিন,
করিলেন শিষ্যগণে গল্প সমীচীন।
দৈববশে সিংহ শিশু মিশি মেষচালে।
শিখিয়া মেষের রীতি রহে মেষপালে।
জানে না আপনা তাই তৃণভোজী হ'য়ে,
পলাত মানবে হেরি পরাণের ভয়ে।
তার পর একদিন শ্রীগুরুর দয়া,
দেখিল সলিলপাশে তার মুখ ছায়া।
বুঝিয়া স্বরূপ নিজ মেষ সঙ্গ ত্যজি,
সিংহদলে গেল শিশু বীর সাজে সাজি।
সেইরূপ আপনারে জানিবে যে দিন,
মানব তোমার ভ্রান্তি ঘুচিবে সে দিন।
হেরিবে এ বিশ্বস্রষ্টা তুমিই মানব,
এ মর সংসারে ভ্রম্ তোমার উদ্ভব।

প্রার্থনা।

কাশীর সাধিকা আশ্রম বহু কষ্টে স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে শিক্ষার কি এই পরিণাম? দেখা গেল জগতে ধর্ম্মের রাস্তা বহু কষ্টকর, কিন্তু অধর্ম্মের রাস্তা অতি সহজসাধ্য ও সুখময়। জগতে ধর্ম্মের রাস্তা এত সহজ হইলে স্বরাজ লাভ কবে হইয়া যাইত। এত লোক দেশের এবং দশের জন্য জীবন দিয়াও সফলতা লাভ করিতেছে না, যাক্, বিশেষ বলা বাহুল্য। যিনি আমাদিগকে কার্য্যে ব্রতী করাইয়াছেন তাঁহার যে কি অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা ভার, তাঁহার নিকট চরম প্রার্থনা যে তাঁহার কাজ তিনিই যেন সম্পাদন করেন। এবং লোকের নিকট আর আমাদিগকে এত দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা যেন ভোগ করিতে না হয়।

নিবেদিকা—
নারায়ণী দেবী।
কাশী সাধিকা আশ্রম
মানস সরোবর, বেনারস সিটী।